~ www.amarboi.com ~

~ www.amarboi.com ~

১৯৯২

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

উৎসর্গ

স্রোতের বিপরীত রাস্তায় অসংখ্য চোরাস্রোত
খানাখন্দ, গোপন বিষ্নকাঁটা।
হোঁচট খাওয়াটা তাই অনিবার্য বাস্তব এক সত্য।
এমনকি হোঁচট খেয়ে মাটিতে পড়ে যাওয়াও।
কিন্তু কিছু মানুষ জানে
সবচেয়ে বড়ো সত্য হচ্ছে– আবার উঠে দাঁড়ানো

সেই মানুষদের হাতে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মানুষ প্রশংসা করতে বাধ্য। করছেও। পেপার-পত্রিকা পর্যন্ত লিখছে– ধন্য বাংলাদেশের এই পার্টি! বাংলাদেশের কোনো রাজনৈতিক দলের কর্মীদের মধ্যে এমন শৃঙ্খলা কেউ কোনোদিন আশা করতে পেরেছে? আজকের এই পরিস্থিতিতে তো কল্পনাই করা যায় না! পার্টি ভাঙছে তো বটেই, পার্টি থাকবে কি না সেই প্রশ্নই যখন সামনে এসে গেছে, তখনও হাজার হাজার কর্মী তাকিয়ে আছে ৭৭ সদস্যের কেন্দ্রীয় কমিটির দিকে। শোনা যাচ্ছে এখন সিরিজ মিটিং চলছে পার্টির টাকা-পয়সা, জায়গা-জমি, সহায়-সম্পত্তি, পত্রিকা-প্রকাশনীর ভাগবাঁটোয়ারা নিয়ে। তবু সব কর্মী নিশ্চুপ। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নামে, শৃঙ্খলার নামে এই রকম ভেড়ার মতো নির্বিবাদ কর্মীবাহিনী যে নেতারা সৃষ্টি করতে পারে, তারা তো পির-মুর্শিদদের চাইতেও কামেল মানুষ।

পল্টনের মোড় যেন থমকে আছে কয়েক মাস ধরে। চায়ের দোকানগুলোতে পর্যন্ত কোনো হুল্লোড়ে আলোচনা-আড্ডা নেই। পার্টির কর্মীরা অনেকেই আগের অভ্যেসে নিয়মিত আসে পল্টন মোড়ে। একে অপরের সাথে দেখা করে, কথাবার্তাও বলে, একসাথে চা-সিগারেটও খায়। কিন্তু প্রাণ নেই কথাবার্তায়। কেউ কাউকে জিগ্যেস পর্যন্ত করে না যে কী ঘটতে চলেছে। জানে যে জিগ্যেস করে লাভ নেই। কেউ বেশি কিছু জানে না। কেন্দ্রীয় কমিটি যা করবে তা-ই হবে। তবে এটা জানে সবাই যে, কেন্দ্রীয় কমিটির ৭৭ জনের মধ্যে ১২ জন ছাড়া সবাই পার্টি বিলোপ করে দেওয়ার পক্ষে। তবু অপেক্ষা– দেখা যাক কী হয়!

হঠাৎ-ই পার্টিশৃঙ্খলার কথা ভুলে গিয়ে এক চল্লিশোর্ধ্ব লোক চিৎকার করতে শুরু করে পল্টন মোড়ের ট্রাফিক পয়েন্টে দাঁড়িয়ে– কীসের ভাগাভাগি অ্যাঁ? কীসের ভাগাভাগি? যারা পার্টি করতে চায় না তারা চইলা যাউক। সাফ কথা।

চেহারা দেখলেই বোঝা যায় মানুষটার মনের মধ্যে বিপুল ঝঞ্ঝা।

একজন এসে তাকে নিরস্ত করার চেষ্টা করে– কমরেড চুপ করেন!

কীসের জন্য চুপ করব? পার্টি মানে কি খালি সেন্ট্রাল কমিটির ৭৭ জন? হাজার হাজার কর্মী নাই? গণ-সংগঠন নাই? খেতমজুর সমিতি নাই? কৃষক সমিতি নাই? ছাত্র ইউনিয়ন-যুব ইউনিয়ন নাই? উদীচী-মহিলা পরিষদ নাই? এই ৭৭ জনের কাছে কি পার্টিরে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দিয়া গ্যাছে লর্ড কর্নওয়ালিস?

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পার্টি থাকবি কি থাকবি না তার সিদ্ধান্ত নেওয়ার এরা কে? সারা দেশের পার্টির সদস্যদের মতামতের কুনো দাম নাই? মতামতের দরকার নাই? কংগ্রেস ডাকুক। কংগ্রেসে সিদ্ধান্ত হোক।

এখন কংগ্রেস ডাকবে কে?

আপনে ডাকবেন। আমি ডাকুম।

ডাকলেই তো হলো না। ডাকার একটা নিয়ম আছে না?

এখনও নিয়ম মারান ভাইজান! এখনও! আরে পার্টির ট্যাকা ভাগ করার অরা কে? ঐ ট্যাকা কি অরা বাপের ঘর থাইক্যা আনছে? যে খেতমজুর প্রতিদিনের বাজার করতে পারে না, সে-ও লেভি দিছে। সেই লেভির ট্যাকা ভাগ করার অরা কে? রংপুরের মণিকৃষ্ণ সেন সব সম্পত্তি দিয়া গেছে পার্টিরে। সেই সম্পত্তি অরা ভাগ করার কে? রতন সেন সবকিছু দিয়া গেছে পার্টিরে। সেইগুলানও ঐ শালাগোর ভোগে যাইব? আইছে অফিস ভাগ করতে। আরে অফিস তো এক কমরেডের দেওয়া জায়গার উপর। যা, সেই কমরেডের ফ্যামিলির কাছে গিয়া পারমিশান নিয়া আয়!

এবার পরিচিত একজন এগিয়ে আসে– আসেন তো ফরহাদ ভাই! বাদ দ্যান!

পাশের লোকেরা সচকিত হয়ে খেয়াল করে– ফরহাদ! কিশোরগঞ্জের জেলা কমিটির সদস্য ফরহাদ! একগুঁয়ে বলে পরিচিতি আছে।

একজন মৃদুকণ্ঠে বলে– একগুঁয়ে হোক আর যা-ই হোক, কথাগুলান তো চরম সত্যি।

কেউ অস্বীকার করে না। কিন্তু কী করবে বা কী করতে হবে এই পরিস্থিতিতে তা কেউ জানে না। সবচেয়ে বড়ো মুশকিল হচ্ছে নিজেরাই এখন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে পারছে না, যে তত্ত্বের উপর দাঁড়িয়ে তারা মুক্তির জন্য যুদ্ধ করেছে এতকাল, সেই তত্ত্বটা নির্ভুল। এমন টলমল করা ইমান নিয়ে কে কবে কোন যুদ্ধে দাঁড়াতে পেরেছে বুক চিতিয়ে?

২

লাজলজ্জা ভয়-- এই তিন থাকলে রাজনীতি লয়।

এত বছর রাজনীতি করেও তার তাহলে এত লজ্জা কেন? সে কি তাহলে কোনোদিনই রাজনীতি করেনি? নাকি রাজনীতিবিদ হতে পারেনি? তাহলে সে ঘর থেকে বেরোতে চায় না কেন? মানুষ নিয়েই রাজনীতি, অথচ মানুষের সামনে পড়লেই কেন্নোর

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মতো কুঁকড়ে যেতে চায় কেন? কারণ তাকে দেখলেই তীব্র শ্লেষ এবং বিদ্বেষের বিষ, যতখানি গলা দিয়ে উগরে দেওয়া সম্ভব, ঢেলে দিয়ে জিগ্যেস করা হয়– শুনলাম তোমাগের পার্টি এখন তিন টুকরা হইছে! তা তুমি এখন কোন টুকরাত আছো?

তেলকুপি ঘাটের কাছে এসে নদী একটা ইউটার্ন নিয়েছে। এতই তীক্ষ্ণ সেই বাঁক যে দেখে মনে হয় নদীর বোধহয় ফিরতি পথ ধরারই ইচ্ছা ছিল। কিন্তু মাটিও তো কম গোঁয়ার নয়। নদীকে চলতেও দেয় আবার বাধাও দেয়। কখনো নদী আসে মাটিকে গিলে খেতে, আবার কখনো মাটি ধীরে ধীরে চর বিছিয়ে জবরদখল করে নেয় নদীর কাছ থেকে যতটা পারে। শেষেরটাই এদেশে এখন বেশি ঘটছে। এলাকার ময়-মুরুব্বিরা গল্প করে, পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে এই নদীর বাঁক এত তীক্ষ্ণ ছিল, আগুয়ান আর ফিরতি স্রোতের মুখ এত কাছাকাছি ছিল যে মনে হতো মাত্র পাঁচ ইঞ্চি মাটির দেওয়াল দুই স্রোতকে আলাদা করেছে। কিন্তু এখন বাঁকের উপর রীতিমতো স্থায়ী বসতি। এখন নদীর ইউটার্ন ভালোভাবে বুঝতে গেলে তেলকুপি ঘাটের বড়ো গাবগাছের মাথায় চড়তে হবে। কেউ কেউ চড়েও। লটকানো ঘুড়ি খুলতে গিয়ে কৈশোরে এই গাবগাছে উঠেছে মনা মাস্টারও। যতবার উঠত গাছে, ততবার ঘুড়ির রঙিন প্রলোভন ছাপিয়ে নদীর এই ফিরতি পথ ধরার তীক্ষ্ণ বাঁক তার খেয়ালি সৌন্দর্য নিয়ে মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলত। তখন অবশ্য সে মনা মাস্টার হয়নি। আর মাস্টার হওয়ার পরে তার আর গাবগাছের মগডালে উঠাও হয়নি। সকালবেলা এইভাবে বেড়াতে আসাটাও কি হয়েছে তেমন একটা? হয়নি। ইচ্ছা হলেও সময় হয়নি আসার।

মনা মাস্টার সবিস্ময়ে খেয়াল করে, এখন তার প্রচুর অবসর। ইস্কুলে ছাত্র পড়ানোর পরে তার আর অবশ্যকর্তব্য বলে কোনো জিনিস নেই। অথচ দুই বছর আগেও প্রতিদিনই তার অবশ্যকর্তব্যের তালিকা বেড়েই চলছিল। স্ত্রী ফিরোজার আক্ষেপ তো নিষ্ফলতা বুঝতে পেরে থেমে গিয়েছিল অনেক আগেই। কিন্তু সিমি, অনুযোগ করার বয়সে পৌঁছেই তার দাবি জানাত কখনো আদুরে ভঙ্গিতে, কখনো তারস্বরে চিৎকারের মাধ্যমে। অবশ্যই মনা মাস্টারের অবশ্যকর্তব্যের তালিকায় ফিরোজা আর সিমি, অর্থাৎ স্ত্রী-কন্যার প্রতি যথাযথ মনোযোগ দেওয়াটাও ছিল। কিন্তু পার্টির কাজের চাপে ক্রমেই সংকুচিত হয়ে আসছিল সিমি-ফিরোজার ক্ষেত্র। পার্টির গ্রুপ মিটিং, কমিটি মিটিং, গণসংগঠনগুলোর খোঁজখবর নেওয়া, তাদের একটার পর একটা লাগাতার কর্মসূচি, বিরোধী দলীয় জোটের সম্মিলিত কর্মসূচি, পার্টির সাপ্তাহিক পত্রিকার বিলিবণ্টন– নতুন গ্রাহক তৈরি, স্টাডি সার্কেল, কর্মীদের জেল-মামলা-জামিন এইসব একটার পর একটা কাজ মিলে তার চারপাশে যে দেওয়াল সৃষ্টি করেছিল, ফিরোজা-সিমির অনুযোগ সেই দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে ফিরে যেত

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নিজেদেরই কাছে। ফলে একসময় সিমিও বুঝে ফেলেছিল, বাবার মনটা খুব করে চাইলেও তাদের জন্য সময় বরাদ্দের সুযোগ খুবই কম এবং তার ফলে, অনিশ্চিত কিন্তু যান্ত্রিক একটা পারিবারিক জীবন।

সেই জীবনে হঠাৎ ছন্দপতন। জীবনে হঠাৎ নেমে আসা যতিচিহ্নের মতো ছন্দপতন। মনা মাস্টার, কমরেড মনোয়ার হোসেনের কাজ কমতে থাকে। কাজ কমতে থাকে, বাড়তে থাকে অস্থিরতা। বাড়তে থাকে প্রশ্ন। নিজের। সঙ্গীদের। কিন্তু কোনো উত্তর আসে না। ফলে আরও বেড়ে চলে অস্থিরতা। এমনকি বাইরে বেরোতেও লজ্জা করে। প্রথমে বার্লিন প্রাচীর। সোলেমান পয়গম্বর যেমন ইয়াজুজ মাজুজের হাত থেকে মানবজাতিকে রক্ষার জন্য তৈরি করেছিলেন অলৌকিক প্রাচীর, তেমনই পুঁজিবাদের পুঁজ-রক্ত-বিষবাষ্প থেকে পূর্বের মানুষকে রক্ষা করার জন্য বার্লিন প্রাচীর। কিন্তু সেই প্রাচীর ভেঙে পড়ল। ভাঙার উদ্যোগ নিল প্রধানত পূর্বের মানুষরাই। একের পর এক পোল্যান্ড, রুমানিয়া, হাঙ্গেরি, চেকোশ্লোভাকিয়া। তারপর একদিন মস্কোয় খণ্ডবিখণ্ড হলো লেনিনের মূর্তি। বিপ্লবের পিতৃভূমি পাশ ফেরাল পুঁজিবাদের দিকে। মনা মাস্টার সামনে পড়লেই ইঙ্গিতে খোঁচা দেয় বিরোধী চিন্তার লোকজন। ফলে বাইরে বেরোনোর কথা মনে এলেই পায়ে ভর করে জড়তা।

এদিকে দেশে কী ঘটল! যে মুহূর্তে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন, সঙ্গে সঙ্গে পার্টি অফিসে তালা। পার্টির পত্রিকা বন্ধ, কার্যক্রম বন্ধ। তারপরেই পার্টি ছেড়ে পালানোর হিড়িক। আগে দেখা যেত ছোটো ছোটো ইস্যুতে পর্যন্ত মিটিং-পর্যালোচনা চলছে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত জুড়ে। আর এখন, এত বড়ো ইস্যুতে একটা পর্যালোচনা মিটিং পর্যন্ত ডাকার লোক নেই। মনা মাস্টার তখন তিক্তমনে ভাবতে বাধ্য হয়, তাদের পার্টিকে লোকে যে বলত রাশিয়ার দালাল, তারা নড়াচড়া করে রাশিয়ার ইঙ্গিতে, মস্কোতে বৃষ্টি পড়লে তারা বাংলাদেশে ছাতা ধরে-- অন্তত নেতাদের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কথাগুলো নিদারুণ সত্যি। যে নেতাদের মনে হতো তাত্ত্বিকভাবে অত্যন্ত সমৃদ্ধ, মানুষের মুক্তির জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করেছেন, তাঁরা রাতারাতি হয়ে গেলেন রূপান্তরপন্থি। জানা গেল, তাঁরা কেউ-ই সর্বস্ব তো দূরের কথা, বিন্দুমাত্র ত্যাগও করেননি পার্টির জন্য। রুবলের বিনিময়ে রাজনীতি করেছেন, নিজেরা পরিবার-পরিজন নিয়ে কাজে-অকাজে রাশিয়া-বুলগেরিয়া সফর করেছেন, নিজেদের ছেলেপুলে, আত্মীয়স্বজনদের উচ্চশিক্ষার জন্য পার্টির মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে পাঠিয়েছেন, এমনকি কেউ কেউ বিদেশে পড়তে পাঠানোর নামে আদমব্যবসাও করেছেন। টাকা কামিয়েছেন দেদার। তখন মনা মাস্টারের কোনো হিসাবই আর মেলে না। সঙ্গীদের প্রশ্নের উত্তর দেবে কী? নিজের প্রশ্নগুলোরই তো কোনো উত্তর জানা নেই।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সিমি এসব বোঝে না। বাপকে কাছে পেয়েই খুশি। খুশি ফিরোজাও। তবে স্বামীর মনঃকষ্ট এবং অস্থিরতা নিজেও কিছুটা অনুভব করতে পারে। নিজে রাজনীতি বুঝুক না বুঝুক, স্বামীকে তো বোঝে। এই রকম পরিস্থিতিতে কীভাবে স্বামীকে সান্ত্বনা দিতে হবে, তা ফিরোজার জানা নেই। সে তাই আরও পতিব্রতা হয়ে ওঠে। তার সান্নিধ্য যাতে স্বামীর ক্ষততে একটু প্রলেপ লাগাতে পারে, সেই চেষ্টায় যথাসাধ্য মগ্ন হওয়ার চেষ্টা করে।

তো মনা মাস্টারের অবসর এখন অনেক। সকাল-বিকাল মেয়ের হাত ধরে হাঁটতে বেরোনোর যথেষ্ট সময় সে এখন পায়। লোকের খোঁচা শোনার ক্ষমতা সে অর্জন করেছিল রাজনীতির শুরু থেকেই। তবে আগে তীক্ষ্ণ উত্তরে প্রতিপক্ষের বুক ছ্যাঁদা করে দিতে পারত তত্ত্ব এবং তথ্যের প্রাচুর্য দিয়ে। এখনকার তথ্য সবই তার প্রতিকূলে। আর তত্ত্ব হয়ে গেছে নড়বড়ে। তাই এখন খোঁচা হজম করতে হয় বেশি। প্রত্যাঘাত করার সুযোগ কম।

জমসেদ আলির প্রশ্নটা না শোনার ভান করে সে। পাড়াতো সম্পর্কে তাকে চাচা বলে ডাকে মনা মাস্টার। কিন্তু দুজনেই দুজনকে ঘৃণা করে তীব্রভাবে। একাত্তরে কাঁধে বাঁশের লাঠি নিয়ে কলেজ মাঠে রাজাকার বাহিনীর সাথে লেফট-রাইট করেছে জমসেদ আলি। কিন্তু এখন সেই জমসেদ আলিদেরই দিন। তাই মনা মাস্টার এড়িয়ে যেতে চাইলেও সে ছাড়ে না– তা তুমি যানি কোন টুকরাত আছো?

আমি মূল পার্টিতেই।

তা সেই মূলডা আসলে কোনডা? শুনতিছি তোমাগের অফিস নাকি দুই ভাগ হচ্ছে? দেয়াল উঠতিছে দুই শরিকের ভাগের মতোন?

তার বুকের কাঁচা ঘায়ে শকুনের নখ দিয়ে আঁচড়ায় জমসেদ আলি। উত্তর না দিয়ে মেয়ের হাত ধরে এগিয়ে যায় মনা মাস্টার। টের পায়, তার পিঠের সাথে লেপ্টে রয়েছে জমসেদ আলির অশ্লীল হাসিভরা দুই চোখ।

ফড়িং দেখে পেছনে ছোটে সিমি। লাফায় মনের আনন্দে। হাততালিতে যেন উড়িয়ে দিতে চায় বাবার মনের মধ্যে পাহাড় হয়ে জমে থাকা কালো মেঘ। একেবারে উবে যায় না। তবে জমাটত্ব কমে। হাসিমুখে মেয়েকে ফড়িঙের পেছনে ছুটতে উৎসাহ দেয় মনা মাস্টার।

কমরেড! মাস্টার সাব!

ডাক শুনে তেমন চমকায় না মনা মাস্টার। এলাকায় কয়েকজন এখনও তাকে কমরেড বলে ডাকে। খুব অল্প কয়েকজন। তাদের মধ্যে একজন আফাজ। ঘাড় ফিরিয়ে তাকায় মনা মাস্টার। দেখতে পায় সেই আদি ও অকৃত্রিম আফাজকে। হাঁটু-ছোঁয়া লুঙ্গি। গায়ের ফতুয়া অনুজ্জ্বল বরাবরের মতোই। কাঁচা মাটি রঙের মুখটা শীর্ণ আগের মতোই। শুধু চোখ দুটো উজ্জ্বল চকচকে। কখনোই

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ওর চোখে মেঘের ছায়া পড়তে দেখেনি মনা মাস্টার। আফাজ বেশ কয়েক বছর থেকে পার্টির মেম্বার। একশ ভাগ খেতমজুর। লেখাপড়া না জানা। ইউনিটের সে-ই একমাত্র খেতমজুর পার্টিসদস্য।

ফতুয়ার পকেট থেকে পাঁচ টাকার একটা নোট বের করে মনা মাস্টারের দিকে হাত এগিয়ে দেয় আফাজ। মনা মাস্টার জানে কীসের টাকা। আফাজের মাসিক লেভি। একমাসও বন্ধ রাখেনি আফাজ। পার্টিরই যেখানে ঠিক নেই, পার্টির অফিস বন্ধ, কাজকর্ম বন্ধ, কবে শুরু হবে, আদৌ শুরু হবে কি না, পার্টি আদৌ থাকবে কি না, পার্টির শিক্ষিত সব কমরেড বন্ধ করেছে লেভি দেওয়া, সেখানে আফাজ একইভাবে দিয়ে যাচ্ছে তার লেভি। তার পুরো দুই বছরের লেভি জমা আছে মনা মাস্টারের কাছে। মনা মাস্টার জানে না কী হবে এই টাকাটা দিয়ে। তবে পার্টি যদি আর না-ই থাকে, তখন না হয় একবারে টাকাটা ফিরিয়ে দেওয়া যাবে আফাজকে। একত্রে একটা বড়ো অঙ্কের টাকা পেলে খুব উপকার হবে আফাজের। ততদিন না হয় টাকাগুলো সঞ্চয় হিসাবেই থাকুক মনা মাস্টারের কাছে। মনা মাস্টার পাঁচ টাকার নোটটি পকেটে রাখে।

আচ্ছা, আফাজ কি সন্দেহ করে না মনা মাস্টারকে? পার্টির দুরবস্থা, অচলাবস্থার কথা কিছুটা তো সে জানে নিশ্চয়ই। সব হয়তো বোঝে না। কিন্তু ভাঙনের সুর যে বেজেছে, সেটি নিশ্চয়ই শুনতে পায়। তবু যে সে তার গতরখাটানো আত্মার টুকরোর মতো টাকা পাঁচটি মাসে মাসে তুলে দিচ্ছে মাস্টারের হাতে, তার কি একবারও সন্দেহ হয় না টাকাটা ঠিক জায়গায় পৌঁছাচ্ছে কি না? সম্ভবত না। কেননা, তাদের শেখানো হয়েছে নেতাকে সন্দেহ করলে পার্টি হয় না। আফাজ সন্দেহ করেনি কোনোদিন মনা মাস্টারকে। মনা মাস্টার সন্দেহ করেনি তার ওপরের নেতাদের। অথচ সেই নেতারা রাতারাতি পরেছে বিশ্বাসহন্তার পোশাক। পথপ্রদর্শকরা মেতেছে পথ ভোলানোর ষড়যন্ত্রে।

তা তোমার দিন-কাল কেমন আফাজ? কাজ-কাম পাচ্ছ?

কই আর কাম কমরেড! আগের মতোন একদিন কাম জুটলে পরের আড়াই দিন নাই। গিরস্ত চাষির জুটলে তার পরে না কিষান-খেতমজুরের কাম। তা দেখেন দেখি, চাষির নিজেরই মরণদশা। পাট বুনে বউ-ঝির গয়না বন্ধক দিয়া, সেই পাটের দর নাই। ধান বুনতে খরচের একশেষ। ধান উঠলে সেই লাভের টেকা যায় ফইড়্যার পকেটে। তাই গিরস্তের যে অবস্থা, খেতমজুরেরও সেই একই অবস্থা। যে গাছের রসে আমরা বাঁচি, সেই গাছই যখন শুকায়া যায়, তখন আমরা কী খাই!

তবু যে তুমি মাসে মাসে লেভির টাকাটা দিয়ে যাচ্ছ?

তা তো দিতেই হবি। তা তো দেওয়াই লাগবি।

কেন? দিতেই হবে কেন?

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বারে, টেকা ছাড়া কি পার্টির কাম চলে? পার্টির কাম না চললে কি বিপ্লব হয়?

আফাজ এখনও বিপ্লবের স্বপ্ন দেখে! মনা মাস্টারের মনের ধোঁয়াশা কেটে যায়। আফাজ তার লেভি পার্টিকে দিচ্ছে না। দিচ্ছে পার্টির মাধ্যমে বিপ্লবকে। বিপ্লবের জন্য। মানুষের মুক্তির জন্য। যে মুক্তির সাথে জড়িয়ে আছে তার নিজেরও মুক্তি। সে, মনা মাস্টার, নিজে কি কখনো লেভি দেওয়ার সময় ব্যাপারটা এইভাবে ভেবে দেখেছে? তার ওপরের স্তরের বড়ো নেতারা?

সারা শরীর রাগে কেঁপে ওঠে মনা মাস্টারের। পার্টির অফিস ভাগ হতে যাচ্ছে, পার্টির প্রকাশনী বেহাত হয়েছে, পার্টির ফান্ড ভাগ করার পাঁয়তারা চলছে। ঐ ফান্ডে আফাজদের টাকা আছে। তাদের রক্ত-ঘামে উপার্জিত টাকা। সেই টাকা কেড়ে নিয়ে যেতে চায় পার্টির মধ্যে লুকিয়ে থাকা ছদ্মবেশী হায়েনার দল।

আফাজ বিদায় নেয়– আমার এট্টু বাজার-খরচ করা দরকার।

আর মেয়ের হাত ধরে বাড়ির পথে হাঁটে মনা মাস্টার।

হঠাৎ সিমি বলে– পাট্‌টি ভালো না।

চমকে ওঠে মনা মাস্টার– কী বললি!

পাট্‌টি ভালো না। খালি মারামারি।

মেয়ের মুখে এমন কথা শুনে থমকে যায় সে– কে বলেছে তোকে?

মা।

তোর মা বলেছে পার্টি খারাপ?

মুকুল ভাই পাট্‌টি করে। সজল ভাই পাট্‌টি করে। মুকুল ভাই চাকু দিয়ে সজল ভাইকে মারল।

তুই দেখেছিস?

দেখেছে বইকি সিমি! তাদের ঘরের দরজাতেই ঘটনাটা। একই পাড়ার ছেলে দুইজন। একই দল করে। ক্ষমতাসীনদের যুব সংগঠন। লক্ষ লক্ষ টাকা চাঁদা আদায়ের ভাগবাঁটোয়ারা নিয়ে গোলমাল। বেলা এগারোটায় প্রকাশ্য দিবালোকে গোটা পাড়ার লোকের সামনে মুকুলের দল চাকু বসিয়ে দিয়েছে সজলের বুকে।

সিমি বলে– তুমি আর পাট্‌টি কর না বাবা। চাকু মারবে।

মনা মাস্টারের মনের চোখে দেশের ভবিষ্যৎ একেবারে খোলা বই হয়ে যায়। এভাবেই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মনে ঘৃণা জন্মানো হচ্ছে রাজনীতির প্রতি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৩

চন্দন বসে আছে বাইরের ঘরের বারান্দায়। চেয়ার বা টুল কিছুই নেয়নি। বসে আছে বেঞ্চিতে। তাকে দেখে মনটা খুশি খুশি হয়ে ওঠে মনা মাস্টারের। অন্তত কথা বলার একজন লোক পাওয়া যায় চন্দন গ্রামে এলে।

কবে এলি?

আজ ভোরেই।

ক্লাস বন্ধ?

না। ক্লাস চলছে। ভালো লাগছে না। তাই চলে এলাম।

এভাবে ক্লাস মিস করলে ক্ষতি হবে না!

আর ক্ষতি! কীইবা আর ক্ষতি হবে। ক্ষতি যা হওয়ার তা তো...

দীর্ঘশ্বাস পড়ে চন্দনের। মনা মাস্টারেরও বুক ঠেলে একই রকম হতাশা বেরিয়ে আসতে চায়। কিন্তু চাপা দিতে পারে।

চল ভেতরে যাই। তোর ভাবি কি জানে তুই এসেছিস?

বোধহয় না।

তাহলে শুধু শুধু বসে আছিস! আমার খোঁজ করেছিলি?

দরকার হয়নি। খাদেম ভাই আমাকে আসতে দেখেই বলল যে আপনি সিমিকে নিয়ে হাঁটতে বেরিয়েছেন। আমিও বুঝলাম, আপনার ফিরতে বেশি দেরি হবে না। তাই বসে ছিলাম।

অনুযোগের সুরে বলে মনা মাস্টার– এইভাবে একা একা বসে থাকে মানুষ!

ম্লান হাসে চন্দন– এখন তো বেশিরভাগ সময়ই আমাদের একা থাকতে হয় মনা ভাই। ক্যাম্পাসের হাজার হাজার ছেলেমেয়ের মধ্যে থেকেও একা।

এসব কথা পরে হবে। চল, ভেতরে চল।

না, মনা ভাই। এখন আর বাড়ির ভিতরে যেতে ইচ্ছা করছে না। ভাবিকে বলবেন আমি পরে এসে দেখা করব।

মনা মাস্টার বোঝে চন্দন তার সাথে একান্তে কথা বলতে চায়। এদিকে স্কুলের সময় হয়ে যাচ্ছে। তবুও সে সিদ্ধান্ত নেয় অন্তত কিছু সময় চন্দনের সাথে কথা বলার। সিমিকে বাড়ির মধ্যে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে বসে চন্দনের পাশে বেঞ্চিতে।

বল!

কী বলব?

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বল কিছু একটা। কথা বলতেই তো এসেছিস।

চন্দন মাথা নাড়ে– কী করব কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। চারদিকে শূন্যতা।

মনা মাস্টার ম্লান হাসে– আসলে শূন্যতা তো নিজের মধ্যে।

ঠিক তাই। জীবনের প্রধান কাজ হিসেবে যাকে গ্রহণ করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম, আজ দেখছি সেই কাজটির মূল দর্শনই প্রশ্নবিদ্ধ। অজস্র প্রশ্ন। কিন্তু উত্তর নেই। কিচ্ছু ভালো লাগছে না। তাই আপনার কাছে ছুটে এলাম।

মনা মাস্টার আবারও হাসে– ভার্সিটির এত বড়ো পরিবেশ, এত বুদ্ধিজীবী, এত স্টাডি সার্কেল, পড়ুয়া চিন্তাশীল মানুষের দল, তারা যেসব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছে না, আমি সাধারণ এক গ্রাম্য স্কুলশিক্ষক কী উত্তর দেব বল!

কিন্তু আমার মনে হয় আপনি পারবেন। আপনার হাত ধরেই আমার রাজনীতিতে আসা। মানুষের মুক্তি যে সম্ভব, সেই বিশ্বাস আপনিই তো প্রথম বুনে দিয়েছিলেন আমার মনে।

আমি এখনও মনে করি মানুষের মুক্তি সম্ভব।

কিন্তু কোন পথে?

কিছুক্ষণের জন্য থমকায় মনা মাস্টার– পথটা এখন একটু অস্পষ্ট হয়ে গেছে বটে। কিন্তু মানুষ যেহেতু মুক্তি চাইবেই, মুক্তি খুঁজবেই, পথটাও আবার খুঁজে পাওয়া যাবে।

হয়তো। চন্দন দ্বিধান্বিত কণ্ঠে বলে– কিন্তু এতবড়ো বিপর্যয় ঘটে গেল মনা ভাই, অথচ আগে কেউ বিন্দুবিসর্গও টের পেল না! এটা কীভাবে সম্ভব! একটা গুলি চলল না, তীব্র কোনো গণআন্দোলনও হলো না, অথচ একটা পুরো সমাজব্যবস্থা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল। তার মানে তার ভিত্তিটা পুরোপুরি ঘুণে খেয়ে ফেলেছিল অনেক আগে। অথচ সেটা দেখার মতো অন্তর্দৃষ্টি বিশ্বের কোনো কমিউনিস্ট তাত্ত্বিকের ছিল না। এই যে আমাদের দেশের এত এত নেতা বারবার রাশিয়ায় যেত, এত ছাত্র সেখানে পড়াশুনা করেছে, কেউ তো বিপর্যয়ের আগে কোনো সংকেত পর্যন্ত দিতে পারেনি।

মনা মাস্টার একটু ইতস্তত করে বলে– একেবারে কেউ যে কিছু বলেনি, তা নয়। কিন্তু পার্টির ভেতরের আমলাতন্ত্রের চাপে বেশি মুখ খুলতে পারেনি।

মানে রাশিয়ার সমালোচনা করলেই সে সিআইএ-র চর!

হ্যাঁ। সেই ভয়ও কিছুটা ছিল।

শুধু সেই একটা ভয়ে কেউ সত্যিটা উচ্চারণ করল না একবারের জন্যও। যে-ই সেখানে গেছে, ঘুরে এসে বলেছে যে সোভিয়েত ইউনিয়ন একটা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

স্বর্গরাজ্য। অথচ, এখন কেউ কেউ বলছে, যারা আমাদের স্বাধীনতার পরপর বাহাত্তর-তিয়াত্তর সালে সেখানে গেছে, তখনই নাকি তারা অনেক সমস্যা খেয়াল করতে পেরেছিল। সে সময়েও নাকি অনেকেই কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি ক্ষুব্ধ ছিল, ছিল সেখানে ভোগ্যপণ্যের অভাব, ছিল পশ্চিমা জীবনযাত্রার জন্য লালায়িত যুব সম্প্রদায়।

তবু গর্বাচভ না এলে হয়তো এমন হতো না। ঐ ব্যাটা নিশ্চিত আমেরিকার এজেন্ট। সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনীতি শেষ করে দিয়েছে গ্লাস্‌নস্ত্ আর পেরেস্ত্রৈকার কথা বলে।

মনে হয় কথাটা ঠিক নয়। গর্বাচভই প্রথম স্বীকার করছিল যে রাশিয়ার অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ। সে তাই কিছুটা পুনর্গঠনের চেষ্টা করেছে।

মনা মাস্টার মানতে চায় না– তথ্য যতটুকু পাওয়া গেছে, তা থেকে মনে হয় গর্বাচভ খুব সূক্ষ্ম পরিকল্পনা করে এগিয়েছে। তার অর্থনৈতিক সংস্কারটা ঠিক কেমন ছিল বল তো! সেটা কি সমাজতন্ত্র ঠিক রেখে সংস্কার, নাকি পুঁজিবাদী পথে অগ্রসর হওয়া? কেউ জানত না। মানে কারও কাছে জিনিসটা পরিষ্কার ছিল না। যদিও বারবার একই মাইক বাজিয়ে গেছে যে সমাজতন্ত্রের পথ সে পরিত্যাগ করছে না। কিন্তু কাজের বেলা কী দেখা গেল? তার এই অর্থনৈতিক পুনর্গঠন দেশের সংকট না কমিয়ে আরও বাড়িয়ে তুলল। আগে যা-ও বা কিছু পাওয়া যেত তা-ও বাজার থেকে উধাও হয়ে গেল। কেউ কেউ বলল যে এটা ষড়যন্ত্র। আমলারা তাদের কর্তৃত্ব হারানোর ভয়ে ষড়যন্ত্র করছে। তা যেটাই হোক, গর্ভাচভ ব্যর্থ হয়েছে, এটাই আসল কথা।

চন্দন যেন নিজের সঙ্গে কথা বলছে এমন ভঙ্গিতে নিচু গলায় বলে চলে– রাশিয়াতেই নাকি কেউ কেউ বলছে যে স্তালিনই নাকি সমাজতন্ত্রকে ধ্বংস করেছেন। তাঁর একক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য তিনি বলশেভিক পার্টির প্রগতিশীল অংশটিকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। হত্যা-গুমখুনে রাঙিয়ে দিয়েছিলেন রাশিয়ার মাটি। তাঁর হাতে সোভিয়েত ইউনিয়ন পরিণত হলো একনায়কত্ববাদী সরকারের অধীন কেন্দ্রীয় উৎপাদন ব্যবস্থা এবং কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার একটি রাষ্ট্র। সমাজতন্ত্রে তো এমনটি হওয়ার কথা ছিল না। সমস্ত ক্ষমতা থাকার কথা ছিল সোভিয়েতের হাতে। সোভিয়েত মানে কমিউন, সমবায়ী স্থানীয় সরকার। অথচ স্তালিনের সময় থেকে সমস্ত ক্ষমতা চলে গেল পার্টির হাতে। এই যখন অবস্থা, তখন পার্টিতে সুবিধাবাদীরা ঢুকবেই। পার্টির ভেতরে-বাইরে আমলাতন্ত্র প্রাধান্য বিস্তার করবেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

স্তালিন সম্পর্কে মিশ্র অনুভূতি মনা মাস্টারের মনে। তার নেতৃত্ব ছাড়া কি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিটলারের জার্মানিকে থামাতে পারত বিশ্ববাসী? স্তালিন না থাকলে ঐ রকম পরিস্থিতিতে শিশুরাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নকে কি রক্ষা করা যেত?

আবার তার হিংস্রতা ও ক্ষমতা নিরঙ্কুশ করার পদক্ষেপগুলোকেও তো মেনে নেওয়া কষ্টকর। পরীক্ষিত ও মেধাবী হাজার হাজার কমিউনিস্ট নেতাকে হত্যা করেছেন স্তালিন। বুখারিনের কথা খুবই মনে পড়ে। বুখারিনকে লেনিন বলেছিলেন 'বিপ্লবের গোল্ডেন বয়'। মনে পড়ে তাঁর স্ত্রী আনিয়ার কথা। কী ভালোই না তিনি বাসতেন বুখারিনকে। সব স্ত্রী-ই হয়তো স্বামীকে ভালোবাসে। কিন্তু আনিয়া লারিনার ভালোবাসা অতুলনীয়। তাদের মধ্যে অনেক ব্যবধান ছিল বয়সের। আনিয়ার বাবা ইউরি লারিন তো ছিলেন বুখারিনের বন্ধু। বিপ্লবের পরে আনিয়ারা সপরিবারে থাকতেন হোটেল মেট্রোপল-এ। একই হোটেলে থাকতেন বুখারিনও। আনিয়া তাদের বাড়িতেই দেখেছেন লেনিন, স্তালিন ও বুখারিনকে। এখানেই লেনিন বলেছিলেন যে বুখারিন হচ্ছেন বিপ্লবের গোল্ডেন বয়। বুখারিনের প্রেমে পড়লেন আনিয়া। একতরফা প্রেম। তাঁর কোনো ইঙ্গিতই স্পর্শ করে না বুখারিনকে। শেষে চিঠির আশ্রয়। প্রেমপত্র লেখা হলো। কিন্তু নিজহাতে তা বুখারিনের হাতে তুলে দেওয়ার সাহস নেই আনিয়ার। ভয়ে ভয়ে আনিয়া গিয়ে দাঁড়ালেন বুখারিনের বন্ধ দরজার সামনে। ঠিক করলেন চিঠিটা দরজার ফাঁক দিয়ে ঢুকিয়ে দেবেন। আনিয়া উবু হয়ে দরজার নিচে গুঁজে দিতে যাচ্ছেন চিঠিটা। এমন সময় এসে হাজির স্তালিন। চিঠি আর গোপনে দরজার নিচ দিয়ে ঠেলে দিতে হলো না। স্বয়ং স্তালিন সেই প্রেমপত্র নিয়ে পৌঁছে দিলেন বুখারিনকে। কমরেডের কাছে কমরেড, বন্ধুর কাছে বন্ধু বয়ে নিয়ে গেলেন তার কাছে লেখা এক দুরুদুরু বুকের কিশোরীর লেখা প্রেমপত্র।

তখন আনিয়ার বয়স ষোলো আর বুখারিনের বিয়াল্লিশ। আনিয়ার বাবা এই সম্পর্কের বিরোধিতা করেননি। কিন্তু দ্বিধা ছিল স্বয়ং বুখারিনের তার দ্বিধা আনিয়ার অল্প বয়স নিয়ে। কিন্তু আনিয়া স্থিরপ্রতিজ্ঞ। অন্য কোনো যুবককে বিয়ে করে তার সাথে সারা জীবন কাটানোর চাইতে বুখারিনের সাথে দশ বছর একত্রে থাকতে পারলেও তার জীবন সার্থক হবে। আহা, সেই প্রার্থিত দশ বছরের বৈবাহিক জীবনও পুরোটা পাননি আনিয়া। তাকে এই পাওয়া থেকে বঞ্চিত করেছেন তাঁর স্বামীর বন্ধু এবং কমরেড স্তালিন।

বিয়ের পরে আনিয়া ও বুখারিন গিয়ে উঠলেন ক্রেমলিনের একটি ফ্ল্যাটে। এই একই ফ্ল্যাটে স্তালিন থাকতেন তাঁর স্ত্রী আত্মহত্যা করার আগ পর্যন্ত। এখানে আসার পর থেকে আনিয়া ধীরে ধীরে বুঝতে পারেন ক্ষমতার লোভ স্তালিনকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে। বুখারিন তো আগে থেকেই বুঝতে পারছিলেন। কিন্তু তিনি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এতটা ভাবতে পারেননি যে তাঁকে হত্যা করা হতে পারে। ভেবেছিলেন বড়োজোর তাঁকে মন্ত্রিসভা ও পার্টি থেকে বের করে দেওয়া হতে পারে। তাতে তাঁর কোনো অসুবিধা হবে না। জীববিজ্ঞানে উচ্চতম ডিগ্রি আছে তাঁর। অধ্যাপনা করে জীবন কাটিয়ে দিতে পারবেন।

১৯৩৫ সালে দেখা গেল স্তালিন ফের স্বাভাবিক আচরণ করতে শুরু করলেন। ফের বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিলেন বুখারিনের দিকে। ১৯৩৬ সালে বুখারিনকে নিযুক্ত করলেন পার্টির পত্রিকা 'ইজ্‌ভেস্তিয়া'র সম্পাদক হিসেবে। এমনকি এক রাষ্ট্রীয় ভোজসভায় সবাইকে অবাক করে দিয়ে মদ টেস্ট করার সময় ঘোষণা দিলেন– লেটস অল ড্রিংক টু নিকোলাই ইভানোভিচ্ বুখারিন্।

মনে হলো স্তালিন সরকারকে গণতন্ত্রায়নের দিকে নিতে চাইছেন। বুখারিন্‌কে সদস্য করলেন শাসনতান্ত্রিক কমিশনের।

কিন্তু আসলে এগুলো ছিল স্তালিনের চাল। সাময়িক বিরতি দরকার ছিল তাঁর। সেই সময়টুকু পার হওয়ামাত্র তিনি খুলে ফেললেন বন্ধুত্বের মুখোশ।

বুখারিন বুঝে ফেলেছেন পরিস্থিতি। কিন্তু কোণঠাসা তিনি। স্তালিনকে ঠেকানোর সাধ্য তখন তাঁর আর নেই। তিনি তখন জাতির উদ্দেশ্যে লিখলেন নিজের অন্তিম বাণী। আনিয়াকে বললেন, এই কাগজ এভাবে রাখা যাবে না। স্তালিনের গুপ্ত পুলিশবাহিনী পুড়িয়ে ফেলবে এটা। নিশ্চিহ্ন করে ফেলবে তাঁর সমস্ত রচনা। কাজেই আনিয়াকে এটা মুখস্থ করতে হবে। সময়-সুযোগ এলে জাতির সামনে উচ্চারণ করতে হবে। তীব্র আতঙ্কে অস্থির আনিয়া। তবু বারবার পাঠ করতে থাকলেন স্বামীর বাণী। মন্ত্রের মতো উচ্চারণ করে চলেন অবিরাম। বুখারিন সেখানে বলেছেন স্তালিনের শঠতা ও ক্রুরতার কথা। বলেছেন লেনিনের নেতৃত্বে সংঘটিত মহান রুশ বিপ্লবকে স্তালিন কীভাবে বিপথগামী করেছেন তার কথা।

বুখারিন্ গ্রেফতার হলেন অচিরেই। প্রহসনের বিচারে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হলো তাঁকে। কোথায় কীভাবে তাঁর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছিল, সে কথা এখন পর্যন্ত কেউ জানতে পারেনি।

বুখারিনের বিচার বা মৃত্যুদণ্ডের সময় উপস্থিত ছিলেন না আনিয়া। তাঁকে তখন স্তালিন পাঠিয়ে দিয়েছিলেন নির্বাসনে। কারাগার থেকে স্তালিনকে চিঠি লিখেছিলেন আনিয়া– 'যোসেফ ভিসারিওনভিচ, কারাগারের মোটা দেওয়ালের ভেতর থেকে আমি সোজাসুজি তোমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলছি, আমি তোমার তামাশার বিচারকে মানি না। তুমি নিকোলাইকে হত্যা করেছ। তুমি খুনি।'

কত প্রেম যে এভাবে রাষ্ট্রযন্ত্র আর সমাজের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে অপমৃত্যুর খাতায় নাম লিখিয়েছে!

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এখন আমরা কী করব মনা ভাই?

চন্দনের প্রশ্নে আবার সেই আগের ধাঁধার জগতে ফিরে আসে মনা মাস্টার। আস্তে আস্তে বলে– দেখা যাক! এখনও তো কিউবা আছে, কোরিয়া আছে, ভিয়েতনাম আছে। তারপরে ধর চীন আছে।

এই প্রথম মনা মাস্টারের সামনে অসহিষ্ণুতা দেখায় চন্দন– বিদেশের কথা বাদ দেন তো ভাই। দেশের কথা বলেন। এই দেশে আমরা কী করব সেই কথা বলেন! আমাদের এই এলাকায় আমরা কী করব সেই কথা বলেন!

৪

চন্দন বেরিয়ে যাওয়ার পরে নিজেও বেঞ্চি থেকে উঠতে যায় মনা মাস্টার। কিন্তু কী যে ঘটে ফলে তার আর উঠে দাঁড়ানো হয় না। এখান থেকে দিগন্তের অনেক দূর পর্যন্ত চোখ যায়। তার বেঞ্চিতে বসেই দেখা যায় সড়ক, মাঠ, তারপর পদ্মপুকুরের পাতলা জল, মাঠও। হঠাৎ-ই মনা মাস্টারের চোখের সামনে থেকে উধাও হয়ে যায় দিগন্ত। তার বদলে তার চোখের সামনে যেন আসমান থেকে নেমে আসে বিশাল এক আয়না। এই সময়টাতে নিজের দিকে তাকানোর মতো বিড়ম্বনা আর নেই। আয়নাতে যাতে নিজেকে দেখতে না হয়, সেজন্য মনা মাস্টার চট করে মুখ ঘুরিয়ে নেয় অন্যদিকে। কিন্তু সেদিকেও যে আয়না! আবার অন্যদিকে মুখ ঘোরালে দেখা যায় সেদিকেও আয়না। উপায় না পেয়ে চোখ বুজে ফেলে মাস্টার। কিন্তু তাতে কেবল আয়নাটাকে আরও বেশি প্রকট উজ্জ্বল দেখা যায়। বাধ্য হয় মনা মাস্টার আয়নার মুখোমুখি হতে।

আয়নার ওপারের মনা মাস্টার তাকে চোখ দিয়ে বর্শা হানে। সেই চোখে নেই কোনো করুণা-সহানুভূতি। তার বদলে শ্লেষ-বিদ্রুপ। কিছুটা ঘৃণাও। ওপারের মনা মাস্টার জিজ্ঞেস করে– আমার সাথে কথা বলতে ভয় কেন তোমার মাস্টার?

মনা মাস্টার উত্তর দিতে পারে না।

কিন্তু আয়নার মানুষ নাছোড়। সে সরাসরি প্রশ্নটা করে– তুমি কি জানতে না যে সোভিয়েত ইউনিয়ন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হয়ে উঠতে পারেনি আদৌ?

কাঁচুমাচু করে মাস্টার– সন্দেহ ছিল। অন্যরা সেকথা বলত। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করতাম না।

কেন বিশ্বাস করতে না?

বিশ্বাস করলে তো আমাদের সামনে কোনো মডেল থাকত না।

তাই বলে মিথ্যাটাকেই সত্যি মডেল ভেবে বসে থাকবে বিনা প্রশ্নে?

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মনা মাস্টার উত্তর করে না।

ওপার থেকে প্রশ্ন ধেয়ে আসে আবার– স্তালিনকে তো তোমরা বেশ গালিগালাজ কর। তা লেনিনকে গালি দাও না কেন? অন্তত সমালোচনাটুকুও কর না কেন?

বিমূঢ় দেখায় মনা মাস্টারকে– লেনিনকে কেন সমালোচনা করতে যাব?

স্তালিন যদি বিষবৃক্ষ হয়, তাহলে সেই বিষের বীজ তো লেনিনেরই পোঁতা।

কীভাবে?

একনায়কত্ব শুরু তো লেনিনেরই হাতে। ভিন্নমত নিষিদ্ধ তো লেনিনেরই হাতে। গোপন পুলিশবাহিনী 'চেকা' তো লেনিনেরই প্রতিষ্ঠা করা। সোভিয়েত ইউনিয়নে বলশেভিক ছাড়া অন্য কোনো পার্টি থাকবে না, এই সিদ্ধান্ত তো লেনিনেরই নেওয়া।

মুখস্থ উত্তর দেয় মনা মাস্টার– শ্রমিক শ্রেণির রাষ্ট্রে তো একটাই পার্টি থাকবে। সেটা শ্রমিক শ্রেণির পার্টি।

আয়নার ওপারের মানুষের চোখ বিদ্রুপে বিকৃত হয়ে ওঠে– রোজা লুক্সেমবুর্গ যে এই বিরোধী দলকে নিষিদ্ধ করার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন সে কথা মনে আছে?

খুব ভালো করে জানি না ব্যাপারটা।

রোজা লুক্সেমবুর্গ সরাসরি বিতর্কে নেমেছিলেন। তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন, সোভিয়েত ইউনিয়নে বিরোধী দল না থাকলে বলশেভিকরা নিজেরাই দানব হয়ে উঠবে। তিনি বলেছিলেন, অন্তত মেনশেভিকদের নিষিদ্ধ করা কোনোমতেই উচিত হবে না। তারাও তো শ্রমিক শ্রেণিরই পার্টি।

এত বছর ধরে বিশ্বাস করে আসা উত্তরটা আবারও বেরিয়ে আসে মনা মাস্টারের মুখ থেকে– শ্রমিক শ্রেণির তো একটাই পার্টি থাকা উচিত।

লেনিনও তোমার মতো এই একই উত্তর দিয়েছিলেন। রোজা লুক্সেমবুর্গ বলেছিলেন যে বুর্জোয়া শ্রেণির যদি একাধিক পার্টি থাকতে পারে, তাহলে শ্রমিক শ্রেণির একাধিক পার্টি থাকলে অসুবিধা কোথায়। তারা তো বরং ক্ষমতাসীন পার্টির ভুল ধরিয়ে দিতে পারে, ক্ষমতাসীন পার্টিকে বাধ্য করতে পারে জনগণের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখতে, জনগণের কাছাকাছি থাকতে। কিন্তু লেনিন শুনলেন না। তখনকার মতো বললেন যে এই একদলীয় ব্যবস্থা সাময়িক। সেই সাময়িক হয়ে গেল চিরস্থায়ী। তারই ধারাবাহিকতায় স্তালিন, ক্রুশ্চেভ, ব্রেজনেভ, এমনকি গর্বাচভও।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

চুপ করে থাকে মনা মাস্টার। কিন্তু আয়না তার কাজ করেই চলে। মনা মাস্টারের বুক খুঁচিয়ে ঘা করার প্রক্রিয়া জারি রাখে– সোভিয়েত ইউনিয়নে যা-ই ঘটেছে সেটাকে তোমরা ঠিক বলে মেনে এসেছ চিরকাল। এতটা মানসিক বশ্যতা কীভাবে অর্জন করলে তোমরা?

মনা মাস্টার আমতা আমতা করে– পার্টির শৃঙ্খলা...

শৃঙ্খলা? নেতারা যা বলবে সেটাকে বিনা প্রশ্নে মেনে নেওয়াকে কেউ শৃঙ্খলা বলে না মাস্টার। বলে দাসত্ব। কীসের লোভে তোমরা মেনে নিয়েছিলে এই দাসত্ব?

লোভ? লোভ তো আমার ছিল না। হাজার হাজার পার্টিকর্মী তো লোভ করেনি কোনোকিছুতে। বরং সবাই ত্যাগই স্বীকার করেছে সামর্থ্য অনুযায়ী।

একথা নিচের স্তরের সব কর্মীর ক্ষেত্রে খাটতে পারে। কিন্তু তোমাদের বড়ো নেতা, জেলার নেতাদের নিয়ে কেন কোনো সন্দেহ হয়নি কোনোদিন? তাদের সব কথাকে বেদবাক্য বলে মেনে চলেছ কেন?

আমাদের ধারণা ছিল যে যত ত্যাগী, সে তত বড়ো নেতা হয়।

আয়নার ওপারের মুখটা বিদ্রুপে, কিছুটা বিরক্তিতেও কুঁচকে ওঠে– তোমার মনে আছে আব্দুস সালামের কথা?

কোন আব্দুস সালাম?

কৃষক সমিতির আহম্মদ আলীর মেধাবী ছেলে আব্দুস সালাম। মনে নেই তার কথা?

এখন মনে পড়েছে।

তার বাপ কৃষক সমিতি করত, মা যেত মহিলা পরিষদের মিটিং-মিছিলে, ছেলে আব্দুস সালাম হাইস্কুলে পড়ার সময় থেকে ছাত্র ইউনিয়ন করত। সেই ছেলেকে পার্টির তরফ থেকে উচ্চশিক্ষার জন্য মস্কো পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলে না তোমরা?

হ্যাঁ।

কিন্তু সে যেতে পারল না। তাকে পাঠাল না তোমাদের জেলা নেতা আর কেন্দ্রীয় নেতা। তার বদলে মস্কো গেল জালাল প্রফেসরের মেয়ে। যার কোনো অবদান নেই প্রগতির আন্দোলনে। কেমন করে গেল মাস্টার?

উত্তর দেওয়ার মতো কোনো কথা খুঁজে পায় না মনা মাস্টার।

তোমার জেলা নেতা টাকা খেয়েছিল জালাল প্রফেসরের কাছ থেকে। ভাগ দিয়েছিল কেন্দ্রীয় নেতাকেও। এই রকম ঘটনা বছরের পর বছর ঘটেছে শত শত ছাত্রছাত্রীর ক্ষেত্রে। তোমরা কিছুই জানতে না বলতে চাও?

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মনা মাস্টার নতমুখে বলে– কিছুটা জানতাম।

তবু তাদের তোমরা দেবতার আসনে বসিয়ে রেখেছিলে মাস্টার। অদ্ভুত। কওমী মাদ্রাসার ছাত্ররাও তো হুজুরদের এতটা বাধ্য থাকে না। তোমাদের পাশের বড়ো জেলার পার্টি সেক্রেটারি যে রাশিয়া পাঠানোর নাম করে একের পর এক সুন্দরী মেয়েদের ভোগ করত সেকথা জানতে না তোমরা?

তার বিরুদ্ধে তো ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল।

তা হয়েছিল ঠিক। তবে কখন? যখন একটি মেয়ে প্রতারিতা হয়ে এই ব্যাপারটি ফাঁস করে দিল তারপরে তো। তার আগে তোমরা তার আচরণ আর কানাঘুষায় তো ঠিকই টের পেয়েছিলে। তখন কেউ কিছু বলোনি কেন? করনি কেন কিছু?

মনা মাস্টারের মাথা ঘুরছে। চোখের সামনে আয়নাটাকেও অস্বচ্ছ দেখাচ্ছে। তার অবস্থা দেখে আয়নার ওপারের মানুষটার যেন একটু মায়া হয়। সে বলে– আচ্ছা যাও, তুমি বিশ্রাম নাও।

৫

বুকশেল্‌ফের কবিতার বইগুলোর দিকে তাকিয়ে নিজের অজান্তেই ঠোঁটে তিক্ত হাসি ফুটে ওঠে। ব্যঙ্গের স্বরে আবৃত্তি করে– তোমাকে আমি কিনে দেব হাঙ্গেরিয়ান ব্রা, তার আগে চাই সমাজতন্ত্র।

এখন কোথায় সেই কবিরা? কেউ হাসিনা, কেউ খালেদার কাছে ভিড়ে গেছেন। আবার কেউ কেউ এতদিনে 'আবিষ্কার' করতে পেরেছেন যে সরাসরি রাজনৈতিক দলের সাথে সংযুক্ত থাকলে নাকি কবিতার 'ক্ষতি' হয়! পারেনও বটে তাঁরা!

অথচ এঁরাই আগে দল বেঁধে রাশিয়া যেতেন, বুলগেরিয়া যেতেন, পূর্ব জার্মানি যেতেন পার্টির স্পনসরে। কমিউনিস্ট পার্টির অফিসে গেলেই দেখতে পাওয়া যেত তাঁদের। কেউ যেতেন ভাই-ভাতিজার জন্য স্কলারশিপের তদবিরে, কেউ যেতেন বাতের চিকিৎসার জন্য যুগোশ্লাভিয়াতে যাওয়ার আব্দার নিয়ে, কেউ যেতেন 'আগামী বছরের' আফ্রো-এশীয় লেখক সম্মেলনে যেন নিজের নাম বাদ না পড়ে তার নিশ্চয়তা চাইতে।

অথচ এদেরকে পার্টিই পরিচিত করেছে সারা দেশে। ছাত্র সংগঠনের সম্মেলনে প্রধান অতিথি বানিয়ে বিমান ভাড়া দিয়ে নিয়ে গেছে জেলায় জেলায়। ছাত্র সংগঠন, সাংস্কৃতিক সংগঠনের সদস্যরা নিজেদের খাওয়ার খরচ থেকে বাঁচিয়ে কিনেছে এইসব লেখক-কবির বই। কারণ তো শুধু সাহিত্যের প্রতি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ভালোবাসা নয়, বরং মূল কারণ হচ্ছে তাদেরকে 'আমাদের কবি' ও 'আমাদের লেখক' ভাবা। সাহিত্যের বিচারে এঁদের বেশিরভাগই টেনেটুনে মাঝারি কাতারে পড়তে পারেন। তবু তাঁদের প্রতি সবসময় পক্ষপাত প্রকাশ করে এসেছে চন্দনরা। সেই 'আমাদের কবি-সাহিত্যিকরা' মুখ না লুকিয়ে একটা বিবৃতি তো অন্তত দিতে পারতেন। বলতে পারতেন সাধারণ কথাটি– আপনারা এতদিন যে সোভিয়েত ইউনিয়ন নিয়ে গলায় রক্ত তুলে ফেললেন, সেখানে সমাজতন্ত্রের পতনের কারণগুলো অন্তত শনাক্ত করে যান। পরবর্তী প্রজন্মের কাজে লাগবে তা। এই কাজটা শেষ কাজ হলেও আপনাদের করে যাওয়া উচিত। কারণ, আপনারা যত ভেতরের কথা জানেন, ততটা অন্যরা জানে না। দরকার হলে আমরাও হাত লাগাচ্ছি আপনাদের সাথে!

আবার তিক্ত হাসি ফোটে চন্দনের মুখে– কেন এসব আশা করে সে! তারা যদি এই কাজটি করতেই চাইতেন, তাহলে তো চন্দনদের এটা নিয়ে ভাবতে হতো না। তাঁরাই ডাক দিতেন। এখন বরং তাঁরা সময় নষ্ট না করে ছুটছেন, কোথায় গেলে পাওয়া যাবে রাজদরবারের পরশ।

ইনাদের চাইতে শামসুর রাহমান অনেক ব্যক্তিত্ববান, অনেক সৎ। কখনো কোনো সুবিধার জন্য যোগাযোগ করেননি। বরং পার্টিই চেষ্টা করেছে তাঁর ইমেজকে নিজেদের কাজে ব্যবহার করতে। তিনিও তা করতে দিয়েছেন সাধারণ মানুষকে ভালোবেসে। সৈয়দ শামসুল হক বা জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে।

পরক্ষণেই আবার মনে হয়, কেন শামসুর রাহমানের সাথে ইনাদের তুলনা করছে সে? প্রতিভার উজ্জ্বলতায় শামসুর রাহমান অনন্য। তিনি তো অন্য সকলের ধরাছোঁয়ার বাইরের। সত্যিকারের বড়ো কবি। সত্যিকারের বড়ো মানুষ।

আহমদ শরীফ, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী পার্টির বাইরের মানুষ। কিন্তু তাঁরা সমাজতন্ত্রের যৌক্তিকতার জায়গা থেকে সরেননি।

সরদার ফজলুল করিম শারীরিক এবং মানসিকভাবে প্রায় অচল। কিন্তু বিপরীত পথ ধরেননি।

মোহাম্মদ রফিক অবশ্য যতখানি পারেন, করছেন। অন্তত শাসকশ্রেণির পেছনের লাইনে গিয়ে দাঁড়াননি। হয়তো তিনিও কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

অবশ্য যতীন সরকার একেবারে অটল। তিনিই যথাসাধ্য জানিয়ে যাচ্ছেন যে, এক দেশে সমাজতন্ত্র টেকার কথা না। টেকেওনি। তা নিয়ে পার্টি ভাঙাভাঙির কী আছে! কিন্তু তাঁর কথা মিডিয়াতে আসছে না তেমন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মনে মনে স্বীকার করতে বাধ্য হয় সে– বদরুদ্দীন উমরের গ্রুপটা এই সময়ে শতকরা একশো নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ। সোভিয়েত ইউনিয়ন বিলুপ্তির কোনো ছাপই পড়েনি তাঁদের সংগঠনের ওপর। কাজে-কথায় তাঁরা একই রকম আছেন। একটা কারণ হতে পারে যে, স্তালিন-পরবর্তী সোভিয়েত ইউনিয়নকে সমাজতান্ত্রিক দেশ হিসেবে গণ্য করেন না বদরুদ্দীন উমর। আর একটা কারণ, কোনো বিদেশি পার্টির প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী চলে না তাঁর গ্রুপ।

সবচাইতে নজর কাড়ার মতো পলটি মেরেছেন আবদুল হালিম। মাঝারি মানের এই তাত্ত্বিকের টিকে থাকার ভিত্তিই ছিল মস্কো আর এই দেশে সিপিবি। সিপিবি-ন্যাপের সাথে সম্পর্কিত কোনো না কোনো দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক, অনিয়মিত পত্রিকাতে তাঁর লেখার বিষয়ই ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের অসামান্য উন্নতি। গর্বাচভের আমলেও যে সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্র নতুন এক উচ্চতায় প্রবেশ করতে যাচ্ছে, সেটাও লিখে যাচ্ছিলেন হালিম সাহেব। কিন্তু যেদিন থেকে বন্ধ হলো মস্কোর মাসোহারা, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কাছে সমাজতন্ত্রের পতন হয়ে গেল 'পৃথিবীর রাহুমুক্তি'। তাঁর নতুন এক প্রবন্ধের শিরোনাম– 'সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বিলুপ্তি– সংকট নয়, রাহুমুক্তি'। উনি জোরেশোরে এখন বলছেন যে পুঁজিবাদই হচ্ছে মানুষের সত্যিকারের পথ। আগে যেসব তথ্য দিয়ে আমেরিকা-ইউরোপের মিডিয়া দাবি করত যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন উৎপাদনের যে প্রচার করছে, তা আসলে মিথ্যা। আবদুল হালিম সেই তথ্যগুলোকে এই প্রবন্ধে প্রাণ দিয়ে সমর্থন জানিয়েছেন। তিনি প্রবন্ধ শেষ করছেন এই বলে যে– 'সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অস্বাভাবিক অস্তিত্বের বিলুপ্তির মধ্য দিয়ে মানবসমাজ আবার যে মানবতার পথে ফিরে আসতে পারল এটা বিশ শতকের মহত্তম ঘটনা। সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বিলুপ্তি, সারা পৃথিবীর মতো বাংলাদেশের জন্যও সুসংবাদ বহন করে এনেছে। স্নায়ুযুদ্ধ-মুক্ত পৃথিবীতে আমরা এখন সহজেই আমাদের দেশকে গড়ে তুলতে পারি।'

এই রকম কথা বলতে পারার মতো নির্লজ্জ লোক এতদিন এই দেশে মার্কসবাদী তাত্ত্বিকের মর্যাদা পেয়েছে!

আবদুল হালিমের সাথে সুর মিলিয়েছেন মতিউর রহমান আর মফিদুল হক। অজয় রায়ও। তবে তাঁরা আবার কিছুটা পরিশীলিত।

সাহিত্য নিয়েও নিজেদের বিভ্রান্তি আর বিতর্ক হুড়মুড় করে ঢুকতে থাকে মনের মধ্যে। একথা খুবই সত্যি যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে এই দেশের পাঠকসমাজ ঋণী থাকবে প্রগতি প্রকাশনীর বইগুলোর জন্য। বিপ্লবের শত বছর আগে থেকেই রুশ সাহিত্যে প্রতিভার অবিশ্রাম মিছিল। সেইসব সাহিত্য পাঠের সুযোগ করে দিয়েছে প্রগতি প্রকাশন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পার্টির নেতাদের সাহিত্যবোধ যে খুব একটা উন্নত নয়, সেটা বোঝা যাচ্ছিল অনেক আগে থেকেই। আর পূর্বসূরি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি তো রবীন্দ্রনাথকে পর্যন্ত বিতর্কের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে ফেলেছিল। পার্টির নেতারা আর যাই হোক, মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিনের সাহিত্যবোধের উত্তরসূরি হতে পারেননি, এটা তো পরিষ্কার। এখনকার অরুচিকর কর্মকাণ্ড সাক্ষ্য দিচ্ছে তাদের নিচু সাহিত্য-সাংস্কৃতিক মানের।

বিভিন্ন জায়গা থেকে চন্দন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যতটুকু পড়ার সুযোগ পেয়েছে, তাতে মনে হয়েছে মার্কস বা এঙ্গেলস বা লেনিন, এমনকি স্তালিনও রাজনীতিতে এভাবে ডুবে যেতে বাধ্য না হলে সাহিত্য-শিল্পকেই গ্রহণ করতেন নিজেদের কাজের ক্ষেত্র হিসেবে। বিশ্বমানবের মুক্তির আন্দোলনের জন্য, পুঁজিবাদের দাসত্ব থেকে মানুষকে মুক্ত করার সংগ্রামের জন্যই তাঁরা বিসর্জন দিয়েছেন নিজেদের সাহিত্য-মেধাকে।

নিজের দলের বা লাইনের লেখক হলেই তাকে ভালো বলতে হবে, এমন উদাহরণ কখনো স্থাপন করেননি তাঁরা। বরং যিনি সত্যিকারের বড়ো লেখক, তাকেই বড়ো বলেছেন তাঁরা। বিপ্লবের পরে একটা কমিউনিস্ট পরিদর্শন করতে গিয়ে লেনিন ছাত্রদের জিগ্যেস করলেন, তারা কি পুশ্‌কিনের লেখা পাঠ করে? ছাত্ররা উত্তর করল– 'আমরা মায়াকোভ্‌স্কি পড়ি। পুশ্‌কিন্ তো বুর্জোয়া ছিলেন।' লেনিন হেসে বললেন– 'মায়াকোভ্‌স্কি ভালো। তবে পুশ্‌কিন্ আরও বেশি ভালো।'

স্তালিনের আমলে সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ নিয়ে খুব মাতামাতি চলছিল। কিন্তু তিনি তাঁর সংগঠনভুক্ত লেখকদের লেখার মান নিয়ে একবার খুব হতাশ হয়ে বলেছিলেন– 'আপনারা লেখার নান্দনিক উৎকর্ষতা বাড়ানোর জন্য বিশ্বসাহিত্য পড়ুন। শেকস্‌পিয়র এবং গ্যেটে পড়ুন।'

লেনিন যেমন তল্‌স্তয়কে বলতেন 'রুশ বিপ্লবের দর্পণ'; তেমনই স্তালিনও মায়াকোভস্কিকে 'মহত্তম রুশ কবি' বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন।

তিক্ত মন নিয়ে চন্দন ভাবে– দলের লেখকের লেখা বলে তাদেরকে কী সব অখাদ্য গিলতে বাধ্য করেছে পার্টি!

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৬

সারা পৃথিবীতেই লেখক-শিল্পীরা সমাজতন্ত্রে আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

কারণ হিসেবে একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করানো হয়। সেই ব্যাখ্যায় বলা হয়– মধ্যবিত্ত সমাজ থেকে উঠে আসা মেধাজীবীরা বামপন্থার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন একটি অপরাধবোধ থেকে। সমাজে বিচ্ছিন্ন এই লেখক-শিল্পীরা মনে করতেন যে বামপন্থি পার্টিতে যোগ দিলে শ্রমিক-কৃষকের সাথে একাত্ম হতে পারবেন। কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেওয়া হচ্ছে তাদের কাছে 'অহং থেকে মুক্তি'। তাদের কাছে পার্টিতে যোগ দেওয়া মানে সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে জীবনের ক্ষুদ্রতাকে অতিক্রম করে যাওয়া। কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেওয়া যেন এক বৃহত্তর ধর্মীয় গোষ্ঠীতে যোগ দেওয়া, যেখানে যোগ দিলে ব্যক্তিগত সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি মেলে, নিজেকে অগ্রসর মানবগোষ্ঠীর সদস্য বলে মনে হয়। ধর্ম-বর্ণ, অর্থ-সচ্ছলতা, শিক্ষা-দীক্ষা নির্বিশেষে পার্টির সদস্যরা হয়ে ওঠে পরস্পরের কমরেড। এ এক অবিস্মরণীয় অনুভূতি। এই অনুভূতির আকর্ষণ আর বিচ্ছিন্নতা থেকে রেহাই পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাই লেখক-শিল্পীদের টেনে নিয়ে যায় কমিউনিস্ট পার্টিতে।

কিন্তু তাঁরা অধিকাংশই আবার শেষ পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে থাকতে পারেননি। এর একটা কারণ হচ্ছে, পার্টির নেতৃত্ব নিজেরা সাহিত্য বোঝেননি, কিন্তু সাহিত্যিকের ওপর খবরদারি করতে গেছেন। এমনকি সাহিত্যিক এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলনের গুরুত্বকেও তাঁরা খাটো করে দেখতেই অভ্যস্ত ছিলেন। কিন্তু কোনো লেখক তাঁদের কোনো লেখায় পার্টিকে বা পার্টির নীতিকে সমালোচনা করছেন– এমনটি দেখতে পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়তেন লেখকের ওপর।

এটাও শুরু হয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের পার্টির আমলাতন্ত্র থেকেই। যাঁরা লেখক হিসেবে ছিলেন নিতান্তই গৌণ, সেই আন্দ্রে ঝ্দানভ, আলেকজান্দার ফাদায়েভরা দখল করলেন সোভিয়েত ইউনিয়নের লেখক সংগঠনের প্রধান পদগুলো। নানারকম বিধিনিষেধের বেড়াজালে আবদ্ধ করতে চাইলেন সাহিত্য এবং শিল্পকে। যে রাশিয়ার সাহিত্যে দেড় শো বছর ধরে ছিল একের পর এক অভূতপূর্ব সাহিত্যপ্রতিভার মিছিল, সেই রাশিয়ার সাহিত্যকে প্রায় ঊষর মরুতে পরিণত করল এইসব নীতিমালা। বড়ো বা সত্যিকারের প্রতিভাবান লেখক-শিল্পীদের থাকে নিজস্ব নীতিমালা। তাঁরা চলেন সেই পথ ধরে। তাঁদেরকে অন্য পথ ধরতে বাধ্য করলে শুকিয়ে যায় তাঁদের সৃষ্টির অনুপ্রেরণা। আবার বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন অধিকাংশ লেখক-শিল্পী। সেই বিদ্রোহ প্রকাশের পথ হয় নানা ধরনের। কেউ কেউ লেখা ছেড়ে দেন। কেউ কেউ নিষেধাজ্ঞা না মেনে নিজের মতো লেখা চালিয়ে যান। রাষ্ট্র তখন ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁদের ওপর। সোভিয়েতে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

স্তালিনের আমলে সেই নিষ্ঠুরতার বলি হয়েছেন আন্না আখ্‌মাতোভা, ওসিপ্ মান্দেল্‌শ্‌তাম, বরিস পাস্তের্‌নাক, এমনকি মাক্সিম গোর্কিও।

স্তালিনের নামের সাথে অমোচনীয় কলঙ্ক হয়ে জড়িয়ে আছে বেশকিছু কবি-শিল্পীকে হত্যা করার ঘটনা। অন্য অনেকের ক্ষেত্রে বলা যায় যে, স্তালিন হয়তো ঘটনাগুলো জানতেন না। কিন্তু ওসিপ মান্দেল্‌শ্‌তাম-এর হত্যাকাণ্ডের সাথে স্তালিনের সরাসরি সম্পৃক্ততা ছিল। এই কবিকে তিনি নিজেই শাস্তি দিয়েছিলেন। তার প্রমাণ, বরিস পাস্তের্‌নাককে করা স্তালিনেরই টেলিফোন। মান্দেল্‌শ্‌তামকে ধরে নিয়ে যাওয়ার পরে এক রাতে বরিস পাস্তের্‌নাকের টেলিফোন বেজে উঠল। ওদিকের কণ্ঠ জানাল– 'কমরেড স্তালিন আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান।'

শোনামাত্র পাস্তের্‌নাক হতভম্ব।

স্তালিনের প্রথম প্রশ্ন ছিল– 'মান্দেল্‌শ্‌তামকে বন্দি করা নিয়ে তোমাদের সাহিত্যিক মহল কী বলাবলি করছে, বলো তো!'

বরিস তোতলাতে তোতলাতে বললেন– 'নাহ্, কেউ কিছু বলছে না। কী বলবে! সকলেই ভীষণ ভীত!'

'ঠিক আছে। কিন্তু মান্দেল্‌শ্‌তাম সম্পর্কে তোমার নিজের মত কী রকম? কবি হিসেবে সে কেমন?'

পাস্তের্‌নাক বললেন– 'বড়ো কবি, ভালো কবি, তবে আমাদের গোত্রের নন। তিনি প্রাচীনপন্থি, ক্ল্যাসিকাল ধারার; আর আমরা পুরানো কাব্যকৌশল সব ভাঙতে চাইছি।'

'তবে, সে কিনা একজন জিনিয়াস। ঠিক কি না?' স্তালিনের প্রশ্ন আসে।

পাস্তেরনাক কী বলবেন এই প্রশ্নের উত্তরে! নিজেকে শক্ত করে বললেন– 'এটা তো কোনো বিবেচ্য বিষয় হলো না। কিন্তু আমরা মান্দেল্‌শ্‌তামকে নিয়ে এত কথা কেন বলছি, বুঝতে পারছি না। আমার অন্য কথা বলার ছিল আপনাকে, অনেকদিন ধরেই বলব ভাবছি।'

'কী কথা?'

বরিস বললেন– 'জীবন ও মৃত্যু নিয়ে।'

সঙ্গে সঙ্গে ঘটাং। টেলিফোন রেখে দিয়েছেন স্তালিন।

অপরাধটা কী ছিল মান্দেল্‌শ্‌তামের? অবশ্যই তিনি বিরোধিতা করতেন স্তালিন আমলের লৌহকঠিন সমাজ পরিচালনার। তবে এইক্ষেত্রে আগুনে ঘি ঢেলেছিল একটি ব্যঙ্গ কবিতা। হায়াৎ মামুদ সেটিকে বাংলায় তর্জমা করেছিলেন। কবিতাটি এই রকম–

"আমরা তো বেঁচে, দেশ আছে কিনা অনুভবে বোঝা ভার;
আমাদের কথা দশ পা গেলেই শোনা যায় নাকো আর।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আলাপচারিতা যেখানেই চলে আদ্ধেক কথাতেই
ক্রেমলিনে চড়ে-বসা পাহাড়ির কথা উঠে আসবেই।
কর-অঙ্গুলি ইয়া মোটা মোটা, কৃমি যেন, মেদে ভরা;
যে-কথাই কয় নিখাদ সত্য দাঁড়িতে ওজন করা।
তেলাচোরা যেন দু'টি শুঁড় তার হাসি-হাসি মুখে চায়,
ঘাড়-তোলা বুট ঝকমক করে সর্বদা চমকায়।
তার চারিপাশ ছেঁকে থাকে সরুগর্দান নেতা মেলা
কেঁচো হয়ে থাকে, ওঠ-বোস করে– সেই তার প্রিয় খেলা।
কেউ শিস্ দেয়, কেউ ডাকে ম্যাও, কাঁদুনি গাইছে ফেউ;
সব থামে তার এক হুংকারে, ঠোঁটটি নাড়ে না কেউ।
ডিক্রির পরে ডিক্রি নাজেল– যেন ঘোড়া চাট্ মারে
কুঁচকিতে কারো, কপালে, ভুরুতে, কারো-বা চোখের ধারে।
ইচ্ছেমাফিক কল্লা কাটছে তার জল্লাদ-রব,
তবু নিজে বুক গরবে ফোলায় ওসেতিয়া-পুঙ্গব।"

হায়াৎ মামুদ ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলেন– 'অন্তিম দুই পঙক্তির পূর্ব পর্যন্ত আভাসে-ইঙ্গিতে বোঝা যাচ্ছিল বটে। ক্রেমলিনের পাহাড়ি লোকটার কথা আছে, আরশোলার গোঁফ-জোড়ায় চেহারার ছাঁদ ফুটে বেরোয়। সরু গর্দান নেতা যে মলোতভ্ তাও খুব অস্পষ্ট থাকে না। তবে, অমন সব কথা তো নির্বিশেষভাবেও বলা চলে কোনো বিশেষের দিকে আঙুল তাক না করে। অন্তত আইনের ফাঁক কিছুটা রয়েই যায়। কিন্তু 'ওসেতিয়া-পুঙ্গব' বলার পরে রাখঢাক আর কিছুই রইল না। ওসেতিয়া হলো রাশিয়ার ককেশাস অঞ্চলে জর্জিয়ার উত্তরে এক জায়গা। এখানকার অধিবাসীরা ইরান থেকে আসা, সে-অর্থে ঠিক জর্জীয় নয়। কথিত আছে স্তালিনের দেহে ওসেতিয় তথা ইরানি শোণিতপ্রবাহ ছিল। গোপন রইল না যে, কবিতার লক্ষ্যভূমি সোভিয়েত ইউনিয়নের একচ্ছত্র অধিপতি স্তালিন। আর তীরন্দাজ এক হতদরিদ্র ও হতমান, লাজুক বেপথু ও প্রায় কুশ্রী, কবি। নাম ওসিপ মান্দেল্শ্তাম।'

না। কোনো পত্রিকায় ছাপা হয়নি কবিতাটি। তার প্রশ্নই ওঠে না সেই জমানায়। মান্দেল্শ্তাম তাঁর কবিতাটি বিভিন্ন সময়ে পড়ে শুনিয়েছিলেন কবিবন্ধুদের কাউকে কাউকে। তাঁদেরই কেউ একজন নিজেকে স্তালিনের একনিষ্ঠ অনুসারী হিসেবে প্রমাণ করার জন্য গোয়েন্দা সংস্থার কানে তুলে দিয়েছিলেন মান্দেল্শ্তামের নাম এবং কবিতাটি।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এ তো গেল যেখানে কমিউনিস্ট পার্টি ক্ষমতায় আসীন, সেই দেশের কথা। যেখানে তারা ক্ষমতায় নেই, সেখানেও পার্টির নির্দেশ ঢালাওভাবে আরোপ করার চেষ্টা হয়েছে পার্টিভুক্ত কবি-সাহিত্যিকদের ওপর। ভারতে সিপিআই-এর নির্দেশিত পথে না চলায় পার্টির আমলা-বুদ্ধিজীবী ভবানী সেন, সুধী প্রধান, চিন্মোহন সেহানবীশের আক্রমণের শিকার হয়েছেন বিষ্ণু দে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো লেখক-কবিরা। হেনস্থার শিকার হয়েছেন আরও অনেকে।

আর আমাদের এখানে!

ফোঁস শব্দে একটা দীর্ঘশ্বাস উঠে আসে চন্দনের বুক থেকে। একটা বই কিনলে দুইদিন বা তিনদিন সকালের নাস্তা বাদ দিতে হতো তাকে। কারণ তার সারা মাসের জন্য যে টাকা বরাদ্দ ছিল তাতে বই কেনার কোনো বাজেট ছিল না। পার্টির সাপ্তাহিক পত্রিকায় যাদের লেখা ছাপা হতো, তাদের বই-ই বেশি কিনত সে। সেই লেখক-কবিরা পার্টির নেতাদের মতোই কী ভেল্‌কিবাজিই না দেখাচ্ছেন!

৭

আরও একটা গ্রুপকে দেখা যাচ্ছে নিজেদের লাইনে অটল থাকতে।

লিফলেটটা দেখতে পেয়ে মনে পড়ে চন্দনের। দশ বছর আগে যেভাবে লেখা হতো, এখনও সেই একই ভাষা লিফলেটের। বাজে কাগজে বাজে প্রেসে ছাপা। বাজে কিন্তু ভয়ংকর। মানুষের মনে কিছুটা হলেও ভয় ধরিয়ে দেয়।

"অমুক ইউনিয়নের অমুক জোতদার, অথবা ইউপি মেম্বার অথবা ইউপি চেয়ারম্যানকে গণ আদালতে বিচার করা হয়েছে। তারপর দেশি অস্ত্রশস্ত্রের সজ্জিত পার্টি ও জনগণের গেরিলা বাহিনীর মাধ্যমে সেই বিচারের রায় কার্যকর করা হয়েছে। খতম করা হয়েছে সেই শ্রেণিশত্রুকে।"

"খতমের পথই বিপ্লবের পথ।"

"কমরেড চারু মজুমদারের খতমের লাইনকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরুন!"

"পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (এমএল)।"

এই লিফলেট এখানে পাওয়ার মানে হচ্ছে হাসু এসেছে এলাকায়। এবং সেদিন বিকেলেই সিএন্ডবি কলোনির মাঠে ঠিকই তার দেখা পেয়ে যায় চন্দন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তীব্র বিদ্রুপ নিয়ে হাসু বলে চন্দনকে– কী কমরেড, তোমাদের সুচিন্তিত পার্টি তো শেষ! অথচ তোমরা যে আমাদের হঠকারী বলো, সেই আমরা কিন্তু ঠিকই আছি। কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। বিপ্লবও করব আমরাই। তোমরা দেখবা তাকায়া তাকায়া।

বিরক্তি চরমে ওঠে চন্দনের। বলে– কয়েকজন জোতদারের গলা কেটে যদি সমাজতন্ত্র কায়েম করা যেত, তাহলে সারা পৃথিবীতে এতদিনে কেবল সমাজতন্ত্রই থাকত।

হাসু দমে না। বলে– অন্তত শ্রেণিশত্রুর সংখ্যা তো কিছু কমাচ্ছি আমরা।

কমছে? শ্রেণিশত্রু কমছে? কীভাবে কমছে? তোমরা যে জোতদারের গলা কাটছ, তার ছেলে তো সেই আসনে বসছে। একজন ইউপি মেম্বারকে তোমরা হয়তো খতম করলে। সেখানে সেই শূন্যস্থান পূরণ করার জন্য এক ডজন লোক দাঁড়িয়ে যায়। এটা একজন মূর্খও বোঝে। কিন্তু তোমরা বোঝো না।

হাসু রাগে না। বলে– তবু তো আমরা নিজেদের মতো চলি। নিজেদের পথে চলি। তোমাদের মতো রাশিয়ার ইঙ্গিতে চলি না। আজ রাশিয়া নাই, তো তোমাদেরও চিহ্ন নাই।

চন্দনের বিরক্তি আরও বাড়ে– আমাদের চিহ্ন থাকবে কি না সেটা দেখতে পাবে ভবিষ্যতে। তবে তুমি যে বললে, তোমরা নিজেদের বুদ্ধিতে চলো, এই কথাটা পুরোপুরি মিথ্যা।

কীভাবে?

আরে বাবা নিজেরাই তো লিখছ চারু মজুমদারের কথা! বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে আজ কুড়ি বছরের বেশি। এখনও তোমরা বলো পূর্ব বাংলা। বাংলাদেশকে স্বাধীন বলে মনে কর না তোমরা এখনও। মুক্তিযুদ্ধেও অংশ নাওনি। কারণ চীনের পার্টি তোমাদের নিষেধ করেছিল পাকিস্তানের বিপক্ষে যেতে। তখন তোমরা 'দুই কুকুরের লড়াই'-এর তত্ত্ব দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ থেকে দূরে সরে রইলে। তোমাদের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত সব ভুল। শুধু ভুল নয়, রীতিমতো অন্যায়।

অন্যায়? কীসের অন্যায়?

অন্যায় নয়! এই যে কিছুদিন আগে তোমরা বামিহালের পুলিশ ফাঁড়ি লুট করলে। খুন করলে কাকে? কয়েকটা সেপাইকে। গরিবের সন্তান ওরা। এইরকম কয়েকটা পুলিশের সেপাই মেরে সরকারকে দুর্বল করা যায়? কখনোই করা যায় না। তোমাদের অনেক আগে ব্রিটিশবিরোধী সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা এই সত্যটা জেনে গেছে। তারা তো অন্তত বড়ো অফিসারদের হত্যা করত। তোমরা হত্যা কর চুনোপুঁটিদের। কারণ তোমরা নিজেরাই চুনোপুঁটি। তোমাদের চিন্তাও চুনোপুঁটি। একটা-দুইটা গ্রামের বাইরের বাংলাদেশটাকে একটুও চেনো না তোমরা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হাসু আসলে এতসব বোঝে না। মাও সেতুং-এর রেডবুকের কয়েকটা কোটেশন ছাড়া আর কিছু জানে না ওরা। হাতে একটা-দুইটা আগ্নেয়াস্ত্র পেয়ে ভাবে যা খুশি তা-ই করতে পারবে। কিন্তু কী ট্র্যাজেডি ওদের! শ্রেণিশত্রু খতমের কথা বলে। কিন্তু থাকতে হয় বিএনপি বা আওয়ামী লীগের বা জাতীয় পার্টির কোনো না কোনো প্রভাবশালীর শেল্টারে তার পক্ষেই বন্দুক ভাড়া খাটাতে হয় ওদের। ওরা যাকে সরিয়ে দিতে বলে, তাকেই শ্রেণিশত্রু নাম দিয়ে খতম করতে হয়। তারপর একটা পর্যায়ে চাঁদা বা ডাকাতির টাকার ভাগবাঁটোয়ারা নিয়ে নিজেদের মধ্যে খুনোখুনি শুরু হয়। পুরোপুরি নিখোঁজ হয়ে যায় একজন-দুইজন-দশজন মানুষ।

চন্দনের খারাপ লাগে হাসুর জন্য। বলে– লেনিনের বড়ো ভাইয়ের কথা জানো তুমি?

হাসু উত্তর না দিয়ে উলটো জানার জন্য জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায়।

চন্দন বলে– উনার নাম ছিল আলেক্সান্দর। রুশ ভাষায় উচ্চারণ। ইংরেজি হলে হয়তো বলা হতো আলেকজান্ডার।

একটু হাসির ভঙ্গি করে হাসু। বলে– তা লেনিনের চৌদ্দ পুরুষের খবর রাখা কি বিপ্লবের জন্য খুব দরকার?

সবার খোঁজ রাখার দরকার নেই। তবে যারা প্রাসঙ্গিক, তাদের কথাটা মনে রাখতেই হবে। আলেক্সান্দরের কথাটা খুবই প্রাসঙ্গিক। অন্তত তোমাদের দলের চিন্তার জন্য হাসু।

তাই নাকি? তাহলে বলো। শুনি।

আলেক্সান্দর ছিলেন লেনিনের বড়ো ভাই। শুধু বড়ো ভাই নয়, লেনিনের হিরোও ছিলেন তিনি। অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন আলেক্সান্দর। কেউ যদি লেনিনকে জিজ্ঞস করত, বড়ো হয়ে তুমি কী হতে চাও; লেনিন উত্তর দিতেন যে বড়ো হয়ে আমি আমার আলেক্সান্দর দাদার মতো হতে চাই। লেনিনের মানস-বিকাশে ব্যাপক ভূমিকা ছিল বড়ো ভাইয়ের। ১৮৮৫-৮৬ সালের গ্রীষ্মের ছুটির সময় সেই ভাই-ই লেনিনের হাতে তুলে দিয়েছিলেন কার্ল মার্কসের ক্যাপিট্যাল বইটি। সেই আলেক্সান্দর যুক্ত ছিলেন নারোদবাদী অতিবিপ্লবী দলের সঙ্গে। এই দল রাশিয়ার জার তৃতীয় আলেক্সান্দরকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। সেটা করতে গিয়ে ধরা পড়েন লেনিনের ভাই আলেক্সান্দর উলিয়ানভ। ফাঁসি হয় তার।

তাই নাকি? হাসু অবাক হয়ে প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ। প্রিয় বড়ো ভাইকে হারিয়ে প্রচণ্ড কষ্ট পান লেনিন। শোকে কাতর হয়ে পড়েন। স্বাভাবিক হতে বেশ কয়েকমাস সময় লেগেছিল তাঁর। তখন লেনিন কী বলেছিলেন জানো?

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হাসুকে এবার সত্যি সত্যিই আগ্রহী দেখায়– কী?

লেনিন বলেছিলেন– আমার ভাইয়ের সাহসিকতা, মানুষের প্রতি ভালোবাসা, মানুষের মুক্তির জন্য আত্মত্যাগ নিয়ে আমি গর্বিত। কিন্তু আমাকে সেইসাথে এটাও বলতে হবে যে আমার ভাইয়ের পথটা ছিল ভুল। ব্যাপক মানুষকে নিজেদের চিন্তার সাথে সম্পৃক্ত না করে, হঠকারী কিছু হত্যাকাণ্ড দিয়ে কোনোদিন বিপ্লব হতে পারে না।

হাসুকে একটু ম্রিয়মাণ দেখায়।

চন্দন বলে– তোমার নেতাদের জিগ্যেস করে দেখ, এটা সত্যি কি না।

ঘাসে স্যান্ডেল পেতে মুখোমুখি বসে ছিল দুজন। চন্দন উঠে দাঁড়ায়– চলি হাসু। তুমি কয়দিন আছ এলাকায়? সাবধানে থেকো!

হাসুও উঠে দাঁড়ায়। ছোটোবেলার বন্ধু তারা। হাসু আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যাওয়ার আগেও দুজনে একসাথে অনেক কাজই করেছে। দুজনেই এটাও বিশ্বাস করে যে রাজনৈতিক বিশ্বাসে দুই মেরুর হলেও একজন আরেকজনের কোনো ক্ষতি অন্তত করবে না।

হাসু বলে– চলো একটু চা খাই!

চন্দন একটু ইতস্তত করে। বলে– এভাবে পাবলিকলি তোমার চলাফেরা কি ঠিক হচ্ছে?

হাসু বলে– আমার কমরেডরা আশেপাশেই আছে। কোনো বিপদ দেখলেই ইশারা করবে। তাছাড়া স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করলেই বরং পুলিশ বা তাদের চরদের ফাঁকি দেওয়া যায় বেশি। ওরা সন্দেহ করতে পারে না তখন।

ও আচ্ছা। চলো।

মারকাজ মসজিদের কোণায় সুবলের চায়ের দোকানে বসে ওরা। চায়ের অর্ডার দিয়ে একেবারেই অপ্রত্যাশিতভাবে হাসু প্রশ্ন করে– নন্দিতার কী খবর?

সঙ্গে সঙ্গে শক্ত হয়ে ওঠে চন্দন। সেইসাথে উদাসও। তবে তাড়াতাড়িই সামলে নিতে পারে নিজেকে। বলে– বিয়েশাদি হয়ে গেছে শুনেছি। ঘরসংসার করছে।

হাসু বলে– সেটা আমিও জানি। কিন্তু তোমার সাথে আর যোগাযোগ হয় না? দেখা হয়নি কখনো?

না।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে হাসু খুব অন্তরঙ্গ কণ্ঠে বলে– এমনটা তো হওয়ার কথা ছিল না। তাই না?

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কী বলবে চন্দন? নন্দিতা বারবার খবর পাঠাচ্ছিল দেখা করার জন্য। জরুরি কথা আছে তার। জরুরি কথা মানে সুযোগ্য এক পাত্রের সঙ্গে তার বিয়ের বিষয়টা প্রায় ঠিকঠাক করে ফেলেছে বাবা-মা। এখন চন্দনের কাছ থেকে ফাইনাল কথা শুনতে চায় নন্দিতা।

দুপুর তিনটায় দেখা করার কথা বেবীদের বাড়িতে। তার আগেই চন্দন অ্যারেস্ট হয়ে গেল এরশাদের পুলিশের হাতে। সকাল ১১টার দিকে। আর তখন পুলিশের হাতে ধরা পড়া মানেই একমাসের ডিটেনশন। জেলখানায় আটকে রইল চন্দন। আর নন্দিতা সন্ধ্যা পর্যন্ত বেবীদের বাড়িতে অপেক্ষা করতে করতে বুঝে নিল যে চন্দন তাকে এড়িয়ে যাচ্ছে। বাড়ি ফিরে বাবা-মাকে জানিয়ে দিল যে তাদের পছন্দের পাত্রকে বিয়ে করতে সে রাজি। চন্দনের ডিটেনশন একমাস থেকে বেড়ে হলো তিনমাস। জেল থেকে বেরোনোর আগেই নন্দিতা চলে গেছে স্বামীর সঙ্গে ঘর করতে।

হাসু একটু উদাস কণ্ঠে বলে– মানুষের মুক্তির জন্য বিপ্লব করতে নেমে কত ধরনের আত্মবলিদানই যে করতে হয় আমাদের! তুমি সেদিন পুলিশের হাতে ধরা না পড়লে পরিস্থিতি তো এই রকম হতো না।

মাথা নাড়ে চন্দন– মনে হয় ফলাফল একই হতো। আমি তো আর বিয়ে করতে পারতাম না তখনই। কাজেই নন্দিতাকে সেই একই সিদ্ধান্তই নিতে হতো।

হাসু কিছু বলে না। তবে একটা দীর্ঘশ্বাস লুকানোর চেষ্টা করে। চন্দন কান্নার মতো হাসে– যা হয়েছে ভালোই হয়েছে। মেয়েটা অন্তত অনেক ভোগান্তির হাত থেকে বেঁচেছে।

৮

রাস্তাঘাটে এখন হাঁটা মুশকিল। মোড়ে মোড়ে চায়ের দোকান হয়েছে। গ্রামের কর্মহীন মানুষ অলস সময় কাটায় এখন সেইসব দোকানের বেঞ্চিতে বসে। দোকানে দোকানে ক্যাসেট বাজে। হিন্দি সিনেমার গান আর সাঈদীর বক্তৃতা সমান তালে বাজে দোকানের ক্যাসেটগুলোতে। ঐ অশ্লীল বক্তৃতাই নাকি ইসলামি ওয়াজ! আগে কেউ কেউ বিরক্তি প্রকাশ করত সাঈদীর ক্যাসেট বাজালে। এখন আর কেউ কিছু বলার সাহস পায় না। হাজার হলেও বিরাট ক্ষমতার অধিকারী মওলানা। তার দল জামাতে ইসলামী এখন সরকারের অংশীদার। কার ঘাড়ে দুইটা মাথা আছে যে তার ক্যাসেট বন্ধ করতে বলবে!

হিন্দু পাড়া তো নীরবে জনশূন্য হয়ে চলেছে বছরের পর বছর ধরে। এখন তার গতি বেড়ে গেছে অনেক। মুর্শিদাবাদ থেকে আসা রিফুজিরা পাকিস্তান আমল থেকেই তক্কে তক্কে থাকে হিন্দুদের জমি-বাড়ি ভোগের সুযোগের। এবার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বিএনপি-জামাত ভোটে জেতার পরে রিফুজিদের নেতা এনায়েত রাজাকার হিন্দু পাড়ায় গিয়ে বলেছে– তোমরা তো বাছা বাংলাদেশের আগাছা! যাও যাও নিজেদের দেশে যাও। যার যার নিজের দেশেই তো থাকা উচিত।

দিলীপ এসে কাঁদতে কাঁদতে একথা বলায় ক্রোধে মাথায় রক্ত চড়ে গিয়েছিল মনা মাস্টারের। ক্ষিপ্ত হয়ে বলেছিল– আর তোরা চুপ করে তা-ই শুনলি! উত্তর দিতে পারলি না! বলতে পারলি না, আমরা আগাছা হতে যাব কেন, আমাদের নাড়ি পোঁতা এই মাটিতে। আগাছা তো তোমরা। জিন্না তোমাদের নিয়ে এসেছে এখানে সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষকে চিরস্থায়ী করতে।

দিলীপ মাথা নিচু করে বলেছে– কী করব দাদা, এখন কি আর বলার উপায় আছে কিছু?

সঙ্গে সঙ্গে থমকে গিয়েছিল মনা মাস্টার। একটু আগে এদেশের হিন্দুদের কাপুরুষ ভেবে তাদের ওপর তিক্ত হয়ে উঠেছিল তার মন। এখন আবার হাড়-কঙ্কাল-মাংসসমেত বাস্তবতার চেহারা ভেসে উঠলে নিজেও অসহায়তায় আক্রান্ত হয়ে পড়ে। সত্যিই তো, তারা কি কোনো নিরাপত্তা বিধান করতে পেরেছে সংখ্যালঘুদের? পারেনি। তাহলে কোন মুখে তাদের অভয় জানাবে! এই যে স্বচ্ছ সুষ্ঠু নির্বাচনের জিগির উঠেছে দেশে-বিদেশে। বলা হচ্ছে এমন নিরপেক্ষ, স্বাধীনভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠান নাকি গোটা এশিয়া মহাদেশে কোনোদিন হয়নি। কিন্তু মনা মাস্টার তো জানে, ভোটের আগের রাতে হিন্দু পাড়ায় গিয়ে শাসিয়ে এসেছিল ক্যাডাররা– যদি এই সেন্টারে ঐ মার্কার ভোট বেশি হয়...! হিন্দুরা তাদের দেখিয়ে দেখিয়ে ব্যালটে সিল মেরেছে। অন্য কোনো দলের পোলিং এজেন্ট পর্যন্ত থাকতে পারেনি হিন্দুপাড়ার সেন্টারে।

এখন আর এসব ভাবতে পর্যন্ত চায় না মনা মাস্টার। চেষ্টা করে পত্র-পত্রিকা পর্যন্ত না পড়ার। কোনো আড্ডা দেখলে এড়িয়ে যেতে চায়। কেননা মনে ভয়, কেউ হয়তো তুলে বসবে অপ্রিয় প্রসঙ্গ। তখন আঁচড় পড়বে বুকের তাজা দগদগে ঘা জুড়ে।

মাঝে মাঝে ভেবেছে, সে নিজেও কেন হচ্ছে না 'চলতি হাওয়ার পন্থি'? তার দলের কত নেতাই তো রাতারাতি ভোল পালটে ফেলেছে। কেউ কেউ যোগ দিয়েছে সরকারি দলে। কেউ আওয়ামী লীগে। অনেকেই জুটে গেছে দেশের সবচেয়ে বড়ো আইনের ডাক্তারের পেছনে। তারা নাকি নতুন দল বানাবে। সেই দল নাকি হবে সত্যিকারের গণতন্ত্রের দল। কেউ কেউ রাজনীতি থেকে অবসর নিয়েছে ঘোষণা দিয়ে। তারা এখন জনসেবা করবে অরাজনৈতিক পন্থায়। মনা মাস্টার সেই রকম যেকোনো একটা পথ বেছে নিলেই তো পারে। তার এলাকার কেউ কেউ তো দিব্যি মানিয়ে নিয়েছে সরকারি দলের সাথে। তার যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ছোটোবেলার সাথি আকমল। দুজন একসাথে বড়ো হয়ে উঠেছে। একসঙ্গে ছাত্র সংগঠন করেছে। একসাথে মূল পার্টির সদস্য পদ পেয়েছে। যে আকমলের বাবা মুক্তিযুদ্ধের শহিদ। সেই আকমল এখন দিব্যি সরকারি দলে যোগ দিয়ে পাওয়ার পলিটিক্স উপভোগ করছে। মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী জামাত-শিবিরের নেতাদের সাথে এক মঞ্চে বসে বক্তৃতা করছে। তার এখন চলাফেরা, উঠাবসা আর খানাপিনা তাদের সাথেই। মনা মাস্টার এতদূর না হয় না-ই করল, এটা তো বলতে পারে যে সে আর পার্টির সাথে নেই। পার্টি থাকল কি না থাকল, দুই ভাগ হলো না তিন ভাগ হলো, পার্টি অফিসের মাঝখানে দেওয়াল উঠবে কি উঠবে না তাতে তার কিছু এসে যায় না। সে তো এখন স্কুলের চাকরির পরে দিব্যি তিন-চারটা ব্যাচ প্রাইভেট পড়াতে পারে, পারিবারিক জমির দেখাশোনা করতে পারে, চাইকি মৌসুমি ফসলের স্টক বিজনেসও করতে পারে। খুব সহজ ব্যবসায়। নতুন ফসল উঠলে– পিঁয়াজ হোক, রসুন হোক, হলুদ হোক– হাট থেকে বা চাষির খেত থেকে কম দামে কিনে নিয়ে দুই মাস ঘরে রেখে দাও। তারপর বিক্রি কর দুইগুণ-তিনগুণ দামে। এই ব্যবসাতে লোকসানের কোনো আশঙ্কা নেই। তার টিনের বাড়িতে দালান তুলতে কয় বছর লাগবে! সৎ পয়সার দালান।

ফিরোজাও তেমনই বলেছে। ইঙ্গিতেও বলেছে, সরাসরিও বলেছে। না, সে দালানকোঠার লোভে বলেনি। বলেছে যাতে তার স্বামীর মনটা অন্য দিকে ব্যস্ত হতে পারে। অন্য কাজে মন বসালে হয়তো মনের কষ্টটা একটু কমবে। তার হৃদয় থেকে অবিরল রক্তক্ষরণ হয়তো বন্ধ হবে।

মনা মাস্টারও সায় দিয়েছে। হ্যাঁ, এই রকমই কিছু একটা করা দরকার। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। কাজে নামতে পারেনি। আসলে এভাবে সে ভাবতে শেখেনি এখনও। কিন্তু কেন যে এই রকমভাবে এখনও ভাবতে পারে না মনা মাস্টার! এখনও পথ হাতড়ে বেড়ায়। মানুষের মুক্তির পথ। ফিরোজা মাঝে মাঝে ঠাট্টার ভঙ্গিতে খোঁচাও দেয়– তোমাগের বড়ো নেতারা এখন আর পার্টির কথা ভাবে না। তাঁইরা সব ভাবনা করার কাম দিছে এখন তোমাক!

এসব ভাবনা কেউ কি কাউকে দিতে পারে! যে নেয়, সে নিজেই নিজের কাঁধে ভাবনার দায়িত্ব তুলে নেয়।

খুব সকালে ঘুম ভাঙার অভ্যেস মনা মাস্টারের। আগে কাজ শুরু করত বিছানা ছাড়ার সাথে সাথেই। এখন হাঁটতে বের হয়। কোনো দিকে কোনো লক্ষ্য ঠিক না করেই হাঁটতে শুরু করে। ফিরোজাও হয়তো তখনও বিছানা ছেড়ে ওঠেনি। তাকে না জাগিয়েই কোনো কোনোদিন বেরিয়ে পড়ে মনা মাস্টার। হাঁটে, গ্রামকে জেগে উঠতে দেখে, মানুষকে চোখ ডলে ঘুম সরিয়ে কাজ শুরু করতে দেখে, গ্রামে বাস

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

করেও যে নিসর্গকে এতদিন আলাদাভাবে খেয়াল করে দেখা হয়নি, সেই নিসর্গকে বুভুক্ষুর দৃষ্টিতে দেখে। আর প্রতি মুহূর্তে মনে হয়, এসব আগে কেন খেয়াল করা হয়ে ওঠেনি! মানুষ যে কত রকম ভাবে বেঁচে থাকে, এটা কি সে আগে জানত?

হরিশপুরের বিলের দিকে গেলে তার মনটা বেশ খুশি খুশি হয়ে ওঠে। এখানে এলে মনে হয়, তাদের রাজনীতি পুরোপুরি ব্যর্থ নয়। এই বিলের খাসজমি তাদের খেতমজুর সমিতি লাল পতাকা গেড়ে কেড়ে নিয়েছিল জোতদারদের হাত থেকে। মাসের পর মাস আইনি লড়াই শেষে প্রকৃত ভূমিহীনরা দখল পেয়েছে বিলের। বিলের ধারে তাদের সারি সারি ঘর। পানি যখন থাকে, তখন ভাসা পানিতে মাছ শিকারের অধিকার তাদের। আবার শুকনো মৌসুমে এখানে ফসল ফলায় তারাই। হরিশপুরের বিলের নামই হয়ে গিয়েছিল লাল পতাকা বিল।

সেই বিলের পারেও চায়ের দোকান। আক্কাস চালায়। সাতসকালে সেখানে পৌঁছে একদিন মনা মাস্টার দেখে চায়ের দোকানে চুলায় আগুন জ্বলে উঠেছে। দৈলার চুলায় পানি চাপিয়েছে আক্কাস চকচকে করে মাজা এনামেলের কেতলিতে। তাকে দেখে ধোঁয়ার আড়াল থেকেও চিনতে পারে আক্কাস। সালাম দেয়। বসার আহ্বান জানায়। বসতে বসতে মনা মাস্টার জিজ্ঞেস করে– এত ভোরে তুমি দোকান খুলেছ আক্কাস! এত সকালে গাহাক আসে চা খেতে?

তা আসে। হেসে বলে আক্কাস– মানষের এখন চায়ের নিশা খুব চাগার দিছে। ভাত খাক না খাক, চা ঠিক খায়।

তাই নাকি?

বসেন খানিকক্ষণ। লিজের চোখেই দেখপেন।

সত্যি সত্যিই কিছুক্ষণের মধ্যেই কয়েকজনকে দোকানে আসতে দেখা যায়। কেউ কেউ তো মনে হয় হাতমুখ না ধুয়েই চলে এসেছে। সেকথা বললে একজন হেসে বলে– চায়ের নিশাত ঘুম ভাঙ্গিছে। এখন চা না খাইলে ঘুম কাটবি না।

অবাক হয় মনা মাস্টার– বলে কী লোকটা!

তার অবাক হওয়া লক্ষ করে একজন– আরে খালি ঘুম কাটা না, ঘুম থাক্যা উঠ্যা চা না খালে আমারে বিলের লোকজনের এখন সকালের হাগা পর্যন্ত হয় না।

হো হো করে হেসে ওঠে দোকানে বসে থাকা মানুষগুলো। মনা মাস্টারও।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৯

ভোর হতে না হতেই পাউরুটি-কলা-পানির বোতল নিয়ে পার্টির অফিসের সামনে এসে থেবড়ে বসেছে ফরহাদ। আজ সে বসেছে ধরনায়। কোনো গালাগালি করছে না। বরং খুব ম্রিয়মাণ তার চেহারা। আজ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে বসেছে, পার্টির সেন্ট্রাল কমিটির যে সদস্য আসবে অফিসে, তারই পা চেপে ধরবে সে। পায়ে মুখ ঘষতে ঘষতে বলবে– পার্টিখান ভাইঙ্গেন না কমরেড! একবার ভাবেন কত মানুষ এই পার্টির জন্য কী না করছে! জেল খাটিছে, জীবন দিছে, আত্মীয় হারাইছে, চাকরি-ক্যারিয়ার বিসর্জন দিছে। কত খেতমজুর কত শ্রমিক এই পার্টির কাম করতে গিয়া দিনের মজুরি হারাইছে। ঘরে হাঁড়ি চড়েনি, পোলা-মাইয়ার মুখে ওষুধ পড়েনি, তাও তারা পার্টির নামে জিন্দাবাদ দিয়া গ্যাছে। একটু ভাবেন কমরেড, এই পার্টির নির্দেশ মানতে গিয়া ছাত্র ইউনয়ন ও যুব ইউনিয়নের কত সোনার মতোন পোলা-মাইয়া তাগের বাপ-মায়ের আশা-ভরসা নষ্ট করিছে। কতজন জীবন দিছে কতভাবে! একবার ভাবেন কমরেড! সেইসব হাজার হাজার পোলা-মাইয়ার কথা ভাইবা নিজেরা একটু শান্ত হন। নিজে পার্টি না করলে না করেন, কিন্তু অফিস থাকুক। যারা পার্টি করবি তারা করুক। অফিসডারে নিশ্চিহ্ন করলে একখান ইতিহাস যে নষ্ট করা হয় কমরেড!

সকাল পেরিয়ে দুপুর হতে চলে। এখন পর্যন্ত কোনো নেতার পা পড়েনি অফিসে। তবু বসেই থাকে ফরহাদ। পাউরুটি-কলা সামনেই পড়ে থাকে। খাওয়ার কথা মনে আসে না তার। পানি অবশ্য খায় দুই-চার ঢোক। তার চোখ বারবার ঘুরে বেড়ায়। একবার তাকায় তালা আটকানো কোলাপসিবল গেটের দিকে, পরক্ষণেই তাকায় চলমান মানুষঠাসা পল্টনের রাস্তার দিকে। কোনো নেতাকেই আসতে দেখা যায় না।

ফরহাদ তখন অতীত হাতড়ায়। টংক আন্দোলন, তেভাগা আন্দোলন, নাচোলের বিদ্রোহ, আন্দামান জেলে যাওয়া বিপ্লবীরা, রাজশাহী জেলখানার খাপড়া ওয়ার্ডে গুলি খাওয়া কমরেডদের সে তখনও যেন নিজের চোখে দেখতে পায়। সে ফিসফিস করে অনুপস্থিত কেন্দ্রীয় নেতাদের উদ্দেশ্য করে বলে– সব ভুইলা গ্যাছেন কমরেড? সকল ভুইলা গ্যাছেন কমরেড? তা ভুলেন। কিন্তু যারা ভুলে নাই, তারারে কাম করবার দ্যান। আপনারা সইরা গেলে যান। কিন্তু যারা মানুষের জন্য এখনও মরবার চায়, তারারে সেই সম্মানের সাথে মরার পথখান বন্ধ কইরেন না কমরেড!

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

১০

স্কুল থেকে ফিরতে সেদিন একটু দেরিই হয়ে গেল। এখন পড়ানো ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের কাজে সময় দিতে হয় মনা মাস্টারকে। আগে পার্টির ব্যস্ততার জন্য সে এসব কাজে সময় দিত না। হেডমাস্টার এবং অন্য শিক্ষকরা তাকে এইসব ব্যাপারে অন্তত বেশ সহযোগিতা করেছে। ভালো শিক্ষক হিসেবে তার সুনাম রয়েছে বরাবরই। পার্টির কাজের মধ্যেও অন্তত কোনোদিন যাতে ক্লাস মিস না করতে হয়, সেদিকে সবসময় সচেষ্ট থেকেছে সে। কোনো কারণে সিডিউল ক্লাস নিতে না পারলে টিফিন পিরিয়ডে বা অন্য কোনো ফাঁকে ক্লাস নিয়ে পুষিয়ে দিয়েছে। পড়ানো ছাড়া স্কুলের অন্য কোনো কাজে তাকে জড়াতে হয়নি। এখন তার অখণ্ড অবসর। স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই বাড়তি দায়িত্ব নিয়ে নেয় সে। তার ভালো লাগে। হেডমাস্টারও খুশি। আবার তাকে বেশি সময় কাছে পেয়ে ছাত্ররাও খুশি।

বাড়িতে ফিরে কোনো কারণ ছাড়াই তার মনে হয়, আজ পরিবেশটা একটু অন্যরকম। সিমিকে দেখা যাচ্ছে নতুন কাপড় পরে ঘরে-উঠোনে ছুটাছুটি করতে। ফিরোজা আজ তাকে অভ্যর্থনা জানায় ফিক করে মিষ্টি হাসি দিয়ে। একটু অবাক হয় সে। বহুদিন ফিরোজাকে এমন চপলমতি হাসিতে দেখেনি সে। কিছু একটা ঘটনা নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু বুঝে উঠতে পারে না বলে একটু একটু অস্বস্তি জাগে। সময় হলে ফিরোজা নিজেই বলবে ভেবে ঘরে ঢোকে সে। কাপড় বদলে হাত-মুখ ধুয়ে উঠতে না উঠতেই ফিরোজা সামনে হাজির করে রাশি রাশি নাশতা। এত রকম আইটেম দেখে ফের ধাঁধায় পড়ে যায় মনা মাস্টার। ফিরোজাকে তখন জিজ্ঞেস করতেই হয়– ব্যাপারটা কী?

ফিরোজা কিছুই না বোঝার ভান করে– কীসের ব্যাপার!

আরে এত আয়োজন কীসের জন্য? আজকে ঘটলটা কী?

কী আবার ঘটবে? মানুষ বছরে দুই-একটা দিন ভালো-মন্দ খায় না! আজকে ইচ্ছা হইছে, দুই-চারটা জিনিস বানাইছি।

কথা শুনে আশ্বস্ত হওয়া যায়। কিন্তু ফিরোজার কথা আর বলার ভঙ্গির মধ্যে আবছা হলেও আলাদা কিছু একটা আছে বলে মনে হচ্ছে। তাই পুরোপুরি নির্ভর হতে পারে না মনা মাস্টার। সুখাদ্যগুলো খেতে ভালোই লাগে, কিন্তু সঙ্গে মনের মধ্যে অস্বস্তিটা থেকে যাওয়ায় ঠিক পুরোপুরি উপভোগ করতে পারে না।

এবার মেয়েকে নিয়ে বেড়াতে যাওয়ার পালা। আজ সিমিকে বড়োসড়ো একটা প্রজাপতির মতো সুন্দর লাগছে নতুন জামা-কাপড়ে। নিজে কাপড় পরতে গিয়ে আবার থমকায় মনা মাস্টার। নতুন একটা শার্ট হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ফিরোজা– পরে দ্যাখো তো জামাটা তোমার মাপে ঠিক হইছে নাকি দেখি!

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মনের মধ্যে তখন পুরো অ্যালার্ম বেজে ওঠে। কী হয়েছে ফিরোজা?

উত্তর না দিয়ে তাদের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে আসে ফিরোজা। এটাও নতুন। তাই মনা মাস্টারের অস্বস্তি আর একটু বেড়ে যায়। তখন খুঁটিয়ে লক্ষ করে ফিরোজার মুখ। সবিস্ময়ে খেয়াল করে ফিরোজাকে আজ একেবারেই অন্যরকম লাগছে। এমনিতেই ফিরোজার অবয়বের মধ্যে এক ধরনের স্নিগ্ধতা রয়েছে। আজ তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অন্য এক লাবণ্যের আভা। ভেতরের কোনো এক আনন্দের উৎস থেকে বেরিয়ে আসছে এই আভা। সেই সঙ্গে মনে হচ্ছে আজ নিজের মুখমণ্ডল ও শরীরের একটু হলেও বাড়তি যত্ন নিয়েছে ফিরোজা। তখনও তার প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়ে ফিরোজা মেয়েকে উদ্দেশ্য করে বলে– ধুলোবালি যেন না মাখে নতুন কাপড়ে! আর অন্ধকার হওয়ার আগে বাড়িত চলে আসবে।

বাইরে বেরিয়ে মেয়েকেই জিজ্ঞেস করে মনা মাস্টার– কী হয়েছে রে মা? তোর মা আজ কিছু বলেছে তোকে?

না তো! সিমি উত্তর দেয়– কিন্তু আমার নতুন জামা খুব সুন্দর তাই না বাবা?

হ্যাঁ মা। খুব সুন্দর। এটা পরে তোমাকে ছোট্ট পরির মতো লাগছে।

হাঁটতে বেরিয়ে নিজের শৈশবকাল কেন যেন মনের মধ্যে উঁকি মারে মনা মাস্টারের। তাদের বাড়ির মূল ফটকের সামনে ছিল অন্তত একশ গজ লম্বা বাগান। বাগানে বাঁশের বেড়া। তারপরে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের খোয়া বিছানো রাস্তা। বাড়িতে কেউ আসতে থাকলে অনেকটা দূর থেকেই তাকে দেখতে পাওয়া যেত। তার মনে আছে সে জানালায় দাঁড়িয়ে রাস্তা দিয়ে লোকের যাওয়া-আসা দেখতে খুব ভালোবাসত। আব্বাকে আসতে দেখলে তো খুবই ভালো লাগত। ব্যবসায় করলেও আব্বার আসা-যাওয়া ছিল অনেকটা অফিসের মতোই ঘড়ির সময় ধরে। সকালে বেরিয়ে যেত। দুপুরে খেতে আসত দুটো-সোয়া দুটো নাগাদ। আবার বেরোত বিকাল চারটার দিকে। আর রাতে ফিরতে তেমন একটা দেখেনি সে। কেননা প্রতিরাতেই আব্বা বাড়িতে ফেরার আগেই ঘুমিয়ে পড়ত সে। তার কেন যেন আজ মনে পড়ছে বারবার সেই দুপুরগুলোর কথা। এর মধ্যেই মায়ের রান্নাবান্না শেষ, তাকে গোসল করিয়ে মা নিজেও গা ধুয়ে নিয়েছে। পরনের শাড়িটা পরিষ্কার। শরীরে হালকা স্নো-পাউডারের সুবাস। তাকে কোলের কাছে নিয়ে মা দাঁড়ায় জানালার সামনে। মনা মাস্টার এখন বোঝে, তার মা শুধু তখন মা-ই ছিল না, ঐ সময় সে পরিণত হতো স্বামীর জন্য প্রতীক্ষমাণা বধূতে। আজ অনেকদিন পরে ফিরোজার মধ্যেও যেন সেই রূপটি দেখতে পেয়েছে মনা মাস্টার। ভালো লাগছে তারও। কিন্তু মন থেকে অস্বস্তির কাঁটাটি কিছুতেই দূর হচ্ছে না। কিছু একটা আছে আজকে। কিন্তু সেটা কী, তা কিছুতেই মনে করতে পারছে না সে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

রাতেও দেখা গেল রীতিমতো শাহী খাদ্য-খানা। কিন্তু কোনো প্রশ্ন না করে মুখ বুজে খেয়ে নেয় মনা মাস্টার। সিমির ছোট্ট বইটার পড়া শেষ হয়ে যায় খুব তাড়াতাড়ি। রাত নয়টা বাজার আগেই ঘুমিয়ে পড়ে মেয়েটা। আজও তাই হলো।

এবার ফিরোজার মুখোমুখি হয় মনা মাস্টার– একটু খুলে বলো তো। আজ বিশেষ কী ঘটল?

ফিরোজার মুখ এবার একটু থমথমে হয়। স্বামীর কাছ থেকে সেটা লুকাতেই বোধহয় তরল কণ্ঠে বলে– তোমার তো অনেক কিছু পালন করতে হয়। অনেক দিবস পালন করতে হয় তোমার। শহিদ দিবস, বিজয় দিবস, বিপ্লব দিবস, লেনিন দিবস, আসাদ দিবস আরও কত যে দিবস তোমার! কিন্তু আমি তো তোমার মতো বড়ো কামের মানুষ না। আমি একটা সাধারণ মেয়েমানুষ। আমার দিবস খুব অল্প কয়েকটা। খুব বেশি হলে দুই-তিনটা। সেই দুই-তিনটা দিবসের একটা আজ।

কী সেটা? প্রশ্নটা অর্ধেক করেই থেমে যায় মনা মাস্টার। মনে পড়ে গেছে। এবং লজ্জায় নুয়ে পড়ে সে– আমাকে মাফ কর ফিরোজা! আমার একেবারেই মনে ছিল না।

এবার অভিমানে থমথমে হয়ে পড়ে ফিরোজার কণ্ঠ– আমাদের বিয়ার বয়স কি অনেক বেশি? আমরা কি খুব পুরানো হয়ে গেছি একজন আরেকজনের কাছে?

সান্ত্বনা দেয় মনা মাস্টার– না ফিরোজা, ব্যাপারটা তেমন নয়। এই বছরটা আমাদের জীবনে শুধু ঝড় আর ঝড়। আমার মনের অবস্থা তুমি তো জানোই। একবারে টালমাটাল হয়ে আছে। তাছাড়া তুমিই বলো অন্য কোনো বছরে আমি কি কখনো ভুল করেছি? যত ব্যস্ততাই থাকুক না কেন, আমি তো এই দিনটির কথা কখনোই ভুলিনি।

তার বুকে মুখ গোঁজে ফিরোজা– আমি জানি। আমি রাগ করিনি। সত্যি বলতিছি একটুও রাগ করিনি। তোমার মনের অবস্থা আমি বুঝব না তো কে বুঝবে। কিন্তু তুমি এইভাবে আর কতদিন চলবে? যা হওয়ার তা তো হইছেই। তুমি তো আর একলা দুনিয়ার সবকিছু পরিবর্তন করতে পারবে না। জীবন যে রকম, তাক সেই রকমভাবে নিয়াই তো চলতে হয়।

ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে মনা মাস্টার– ঠিকই বলেছ হয়তো। কিন্তু মানুষের মন তো মনই। মনের ওপর তো জোর করে হাত খেলানো যায় না। আমার মন খারাপটা সহজে কাটছে না। তবে কেটে যাবে।

ফিরোজা ঠেস দেয়– হ্যাঁ, মন তো একলা তোমারই আছে!

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হেসে ফেলে মনা মাস্টার– বাদ দাও ওসব কথা। এখন আজকের দিবসটাকেই উদ্‌যাপন করা হোক। এসো!

ফিরোজা একটুও দ্বিধা করে না। এই মুহূর্তে সে চলে গেছে দশ বছর পেছনের এক দিনে। সেদিন প্রথম তারা বুঝতে পেরেছিল তারা পরস্পরকে ভালোবাসে।

আপ ট্রেনটা ঝিকিয়ে ঝিকিয়ে চলে যাওয়ার পরে রেললাইনের ওপারে আগুন মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা শিমুল গাছগুলো দৃশ্যমান হয়। তার পাশ দিয়ে গঞ্জের বর্জ্য নিয়ে বয়ে যাওয়া খালটি শিমুল গাছগুলোর দিকে ছোটে যেন পরিশুদ্ধ হতে। ট্রেনের পেছনে লোহার হাতল ধরে প্রায় ঝুলন্ত অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকা দুটি ছেলে তাদের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ছিল। তারা ট্রেনসহ, ছোটো হতে হতে উত্তর দিকে মিলিয়ে যাওয়ার সময় শব্দ ওঠে– কু-উ-উ। ট্রেনের হুইসেল নাকি শিমুল গাছের ডালে বসা কোকিলের ডাক, তা আলাদা করে বোঝা যায় না। আবিষ্ট গলায় মনোয়ারের জিজ্ঞাসা– কী সুন্দর! নাহ্ ...? শুনেও ফিরোজার ঘোর তো কাটেই না বরং তার ভালোলাগার বোধ শুধু বাড়তে থাকে। তার বুক কোনো দৃশ্যমান কারণ ছাড়াই ঢিবঢিব করতে থাকে। মনোয়ার, যে তার দিকে কোনো সময়ই সরাসরি তাকায় না, হয় বইয়ের পাতায়, নয়তো জানালা দিয়ে বাইরে, কিংবা ঘরের টিনের চালার দিকে তাকিয়ে ফিরোজাকে পড়ানোর কাজ সারত, অভ্যাসবশত সে এখনও তাকিয়ে নেই ফিরোজার দিকে। তার চোখ দিগন্তের দিকে। কিন্তু দিগন্তও কোনো কোনো সময় আয়না হতে পারে। হয়েছেও তাই। ফিরোজা বোঝে।

ফাল্গুনের বাতাস দেড়ফুটি ধানচারাগুলোকে বেঁকিয়ে দিয়ে তাদের দিকে ধেয়ে আসে কিছু ঝরাপাতা সমেত। ফিরোজা মনোয়ারের দিকে তাকিয়ে বলে– মাথার চুলে পাতা।

মনোয়ার নিজের চুলে হাত বোলায়। একটা পাতা চুলের ফাঁদ থেকে খসিয়ে তাকায় ফিরোজার চুলের দিকে। ফিরোজার মুখে আমন্ত্রণের স্মিত হাসি।

অবশেষে মনোয়ারের হাত অগ্রসর হয়। মনে হয় অশেষ প্রস্তর যুগ, তাম্র যুগ, লৌহ যুগ পেরিয়ে মনোয়ারের কাঁপা কাঁপা হাত অবশেষে স্থিত হয় ফিরোজার চুলে। আর ফিরোজার সমস্ত অন্তর ভূমিকম্পের মতো কেঁপে কেঁপে প্রচণ্ড খুশিতে বান ডাকা নদীর মতো ফেঁপে ওঠে কলকলিয়ে।

আজ দশ বছর পরেও মনা মাস্টার হয়ে যাওয়া মনোয়ারের হাতের স্পর্শে সেই একই বানডাকা শিহরন ফিরোজার প্রতিটি লোমকূপে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

১১

ফরহাদের কণ্ঠ আজ খুবই জোরালো। মাইক সামনে নিয়ে চিৎকার করছে– আইজ একটা হেস্তনেস্ত হইবো। হইতে হইবো। আইজ আমি একলা আসি নাই। আমার সাথে অনেক মানুষ। কব্বর থাইকা উইঠা আইছে সব কমরেডরা। তাগো নিয়া আইজ আমি একখান বিহিত করতে চাই।

কবর থেকে উঠে আসা কমরেড!

লোকজন বাড়তি সচকিত হয়।

অনেকগুলো বাঁধানো ফটো ফরহাদ ভাইয়ের হাতে। প্রথম ফটোটা তুলে মেলে ধরে জনতার সামনে। বলে– চিনবার পারেন? ও পার্টির নেতারা! ইনারে চিনবার পারেন? ইনি হইলেন সোমেন চন্দ। আপনেরা কেমনে চিনবেন! রণেশদা থাকলে চিনবার পারতেন। সত্যেনদা পারতেন। আপনেরা যখন জন্মান নাই, তখন এই সোমেন চন্দ পার্টির লাইগা শহিদ হইছিলেন। বড়ো লেখক হইবার পারতেন তিনি। ডাক্তারও হইবার পারতেন। কিন্তু তা না হইয়া পার্টির কমরেড হইছিলেন। পার্টির সমাবেশ সফল করার লাইগা মিছিল আননের সময় মারা পড়ছিলেন আরএসএস দলের গুন্ডাদের চাকু খাইয়া। এই পার্টি সেই সোমেন চন্দের। পার্টির অফিস ভাঙার পারমিশন নিছেন তার কাছ থাইকা?

এবার আরেকটা ফটো হাতে তুলে নেয় ফরহাদ– এই যে জিগান শহিদ কমরেড তাজুলরে। ওরে তো আপনেরা পাঠাইছিলেন আদমজী জুটমিলে। বদলি শ্রমিকের কাম নিয়া এমএ পাশ মানুষটা গেল পার্টির ট্রেড ইউনিয়নের দায়িত্ব পালন করতে। বাড়িত ছিল ছোট্ট ফুটফুটে মাইয়া। প্রায় নতুনই বউ। কারও কোনো চাওয়ার কথা ভাবল না মানুষটা! তার চাই বিপ্লব। আপনেরা সেই বিপ্লবের নামে তারে পাঠাইলেন শ্রমিকের মধ্যে কাম করতে। তাকে খুন করল এরশাদের পোষা গুন্ডা সাদু বাহিনী। একটা বিচার পর্যন্ত হইল না। আপনাদের ভুল সিদ্ধান্তের শিকার হলো কমরেড তাজুল। আইজ পার্টি ভাগ করবার আইছেন? জিগাইছেন কমরেড তাজুলরে?

বলতে বলতে হু হু করে কেঁদে ফেলে ফরহাদ। সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য তার কাছে গিয়ে যারা দাঁড়ায়, তাদের চোখেও পানি। কমরেড তাজুলকে প্রায় সকলেই চিনত। তার শহিদ হওয়ার ঘটনাটি সবাইকেই খুব স্পর্শ করেছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রিপ্রাপ্ত একজন যুবক নিজেকে এভাবে বিলিয়ে দিলেন পার্টির কাজে, বিপ্লবের কাজে। স্ত্রী-কন্যাকে নিঃসহায় রেখে চলে যেতে হলো পৃথিবী ছেড়ে। তার কথা মনে পড়লে এমনিতেই চোখে পানি চলে আসে সবার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পল্টনের প্রায় সব চায়ের দোকানদার, পত্রিকা-বইয়ের দোকানদার, সব হকারই চিনত তাজুলকে। তারাও খুব আবেগ-বিহ্বল হয়ে পড়ে।

সবার আবেগ সম্মিলিত হয়ে আরও বাড়িয়ে দেয় ফরহাদের কান্না। ফ্যাঁসফেসে কণ্ঠে চিৎকার করতে থাকে সে– আপনারা যারা পার্টি ভাঙতে চান, পার্টির অফিস ভাঙতে চান, তারা যান! জিগ্যেস করে আসেন শহিদ কমরেড তাজুলকে। আপনাদের এই কাজে তার সমর্থন আছে কি না তা না জেনে কীভাবে ভাগ করেন পার্টি? তারে না পাইলে মতামত নেন তার স্ত্রীর, তার ছোট্ট কন্যার। পার্টির ওপর তাগো দাবি আপনাদের চাইতে অনেক বেশি।

ঠিক! ঠিক!

শব্দ ওঠে পাশ থেকে।

এবার একটার পর একটা ফটো তুলে ধরতে থাকে ফরহাদ।

এই যে কম্পরাম সিং। রাজশাহীর খাপড়া ওয়ার্ডের শহিদ।

এই যে শাহাদত। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শহিদ।

এই যে নিজামউদ্দীন আজাদ। বেতিয়ারা মুক্তিযুদ্ধের শহিদ।

মতামত নিছেন আপনারা? তারা কি পার্টির কেউ না?

এই শহিদদের নিয়া আমি অনশনে বসতিছি। আমি আপনাদের ছাড়ব না!

১২

আবার সেই একই চিন্তা মন আর মস্তিষ্ক দখল করে নেয়।

'রাশিয়ায় এসেছি– না এলে এ জন্মের তীর্থদর্শন অত্যন্ত অসমাপ্ত থাকত।'

রবীন্দ্রনাথের সেই রাশিয়া এখন কোথায় পৌঁছেছে! ইতিহাসের কোন অন্ধগলিতে ঠাঁই নেবে আজকের বিলুপ্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন?

এক বছর আগেও কেউ বুঝতে পারেনি কতখানি ঘুণ লেগেছে সমাজের সবগুলো স্তম্ভে। ইতিহাসবিদ ভ্লাদিমির কাভালিয়োভ তখনও ক্লাসে সেরিনা জাহানদের সামনে পেরেস্ত্রৈকার যৌক্তিকতা নিয়ে বাক্যজাল বিস্তার করে চলেছেন। তাঁর মতে পেরেস্ত্রৈকা সফলভাবে সম্পাদনার অন্যতম প্রধান শর্ত গ্লাস্নস্ত বাস্তবায়ন। গ্লাস্নস্তের মাধ্যমেই সোভিয়েত সমাজের নৈতিক উন্নয়ন, কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সাধারণ সোভিয়েত নাগরিকের পারস্পরিক নৈকট্য গড়ে তোলা সম্ভব। কিন্তু কেউ কেউ মনে করত, এই দুই নীতি গ্রহণ করার প্রধান কারণ হচ্ছে স্তালিনকে, স্তালিনের চিন্তাকে, সোভিয়েত সমাজজীবন থেকে পুরোপুরি নির্মূল করা।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

রাশিয়া বাদে সোভিয়েতের অন্য প্রজাতন্ত্রগুলোর মানুষের মনে অসন্তোষ। কারও কারও কথায় প্রকাশ পায় ক্রোধ– 'রুশীরা কী মনে করছে? সোভিয়েত ইউনিয়নের বাকি প্রজাতন্ত্রগুলো কি মস্কোর কলোনি?' সে সময় কোনো বিদেশি রাশিয়ার বাইরে অন্য কোনো প্রজাতন্ত্রে গেলে সুস্পষ্টভাবে দেখতে পেয়েছে তাদের রাশিয়া-বিমুখতা। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা বা তাত্ত্বিকরা তা দেখতে পাননি। ইউক্রেন, আজারবাইজান– যেখানেই যাওয়া যাক না কেন, অনেকেই রাশিয়ার একক কর্তৃত্বকে শোষণের নামান্তর মনে করছে। তবে কেউ কেউ আশা করছে গর্বাচভের নতুন নীতি হয়তো বাঞ্ছিত পরিবেশ গড়ে তুলতে পারবে। বিদেশি ছাত্ররা পড়তে এসেছে গণমৈত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ে। কেউ কেউ ব্যথিত চিত্তে খেয়াল করছে 'গণমৈত্রী বিশ্ববিদ্যালয়' থেকে 'মৈত্রী' আর 'বিদ্যা' শব্দ দুটি হারিয়ে গেল। তার জায়গা দখল করল নতুন দুটো শব্দ– 'স্মাগলিং' আর 'ডলার'। পুরো দেশের বাজার, সমাজ, সংস্কৃতিটাকে খুবলে খেতে শুরু করে দিয়েছে 'ছাত্র' নামধারী একদল স্মাগলার। তাদের মধ্যে অনেকেই বাংলাদেশি। ডলারের বিপরীতে রুবলের দাম পড়ে যাচ্ছে। এত দ্রুত আর চিন্তার অগম্য সেই বিনিময়-হার যে শুনলে অবাস্তব মনে হয়। প্রখ্যাত অধ্যাপক লামকো সারাজীবনে সঞ্চয় করেছিলেন দশ হাজার রুবল। নতুন বাস্তবতার রাশিয়ায় আজ দশ হাজার রুবলের দাম মাত্র দুই ডলার।

৫০০ ডলার দিলে রেড ডিপ্লোমা কিনতে পাওয়া যায় অনায়াসে। রেড ডিপ্লোমা ছিল সোভিয়েতের শিক্ষাব্যবস্থার সব থেকে সম্মানজনক স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। শিক্ষকদের বিদেশি মদ খাওয়াতে পারলে পরীক্ষার ফলাফল নিয়ে কোনো চিন্তা নেই। যে মেয়েরা মদ খাওয়াতে পারছে না, তারা শিক্ষকের বিছানায় যাচ্ছে। মেয়েদের হোস্টেলের কথা না বলাই ভালো। সবই পণ্য। প্রেমও।

অর্থনৈতিক জীবনে সর্বব্যাপী অন্ধকার। যেকোনো দোকানে লাইনের দৈর্ঘ্য দেখলে মানুষ নিরুৎসাহিত হয়ে পড়তে বাধ্য। অথচ ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থেকেও জিনিস পাওয়ার কোনো নিশ্চয়তা নেই। কারণ দোকানে বিক্রি করার মতো জিনিসই নেই। খাবার, জামাকাপড়, জুতো, বাসনপত্র সবকিছুর অভাব। মায়েরা এক দোকান থেকে আরেক দোকানে ছুটে বেড়াচ্ছে, কিন্তু জোটাতে পারছে না শিশুর মুখে তুলে দেওয়ার মতো দুধ। আবার এদিকে সমাজে সৃষ্টি হয়ে গেছে নব্য এক এলিট শ্রেণি। তাদের বিলাসী জীবন কল্পনাকেও হার মানায়। হঠাৎ যেন অনাথ হয়ে গেল সোভিয়েত নাগরিকরা। একটা সর্বজনীন বিভ্রান্তি আচ্ছন্ন করল রুশ যুবসমাজকে।

৯১-এর জুন মাসে অনুষ্ঠিত হলো রাশিয়ার প্রথম প্রেসিডেন্সিয়াল ইলেকশন। নির্বাচিত হলো বরিস ইয়েলিৎসিন। গর্বাচভ ছুটি কাটাতে গেল কৃষ্ণ সাগরের তীরে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ক্রিমিয়া স্বাস্থ্যনগরে। হঠাৎ দেখা গেল রাস্তায় ট্যাংক নেমেছে, আর্মি টহল দিচ্ছে পুরো শহর, চারদিক থমথমে। শেষ পর্যন্ত বোঝা গেল ক্যু হয়েছে, ক্ষমতা দখল করেছে ভাইস প্রেসিডেন্ট গেন্নাদি ইনায়েভ। টিভিতে রাত নয়টার সংবাদে রাশিয়ার মানুষ দেখল একটা ডিক্রি জারি করা হয়েছে। বলা হয়েছে, অসুস্থতার কারণে প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্বাচভ সোভিয়েত প্রেসিডেন্সির দায়িত্ব পালনে অপারগ। এই অবস্থায়, সোভিয়েত সংবিধানের ১২৭(৭) ধারা অনুসারে আজ, ১৯ আগস্ট ১৯৯১ থেকে সোভিয়েত প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব ইনায়েভের। বিকাল সাড়ে পাঁচটায় জানা গেল ক্যু ব্যর্থ। ধরা পড়েছে বিদ্রোহীরা। রাত সাড়ে নয়টায় টিভির পর্দায় দেখা গেল গর্বাচভকে, বিমানের সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসতে। এ যেন একটা খেলা। এদিকে কমিউনিস্ট বিদ্বেষের বিষ ছড়াতে শুরু করেছে ইয়েলিৎসিন। তার আচরণ দেখে মনে হচ্ছে, সে শুধু রাশিয়ার নয়, সমস্ত সোভিয়েত ইউনিয়নেরই শাসনকর্তা। গর্বাচভ নিজের ভুল স্বীকার করেছে, এই মর্মে পরদিন সকালে খবর বেরোল ইজভেস্তিয়া-র প্রথম পৃষ্ঠায়। এরই মধ্যে স্বাধীনতা ঘোষণা করল ইউক্রেন, যে কিনা সোভিয়েত ইউনিয়নের শস্যভান্ডার। ডিসেম্বর মাসে টেলিভিশনে মাত্র পাঁচ মিনিটের একটা ভাষণ প্রচারিত হলো গর্বাচভের– সোভিয়েত ইউনিয়ন নামের কোনো কিছুর আর অস্তিত্ব থাকবে না।

নতুন রাশিয়ায় পড়ল নতুন বছর। মার্কিন নাটের গুরুদের আহ্বানে আমেরিকায় গেল ইয়েলিৎসিন। নিজেদের অস্ত্রভান্ডার অক্ষুণ্ন রেখে রাশিয়ার অস্ত্র ধ্বংস করানোর চুক্তি করল আমেরিকা। বিনিময়ে ইয়েলিৎসিনের হাতে তুলে দেওয়া হলো ২৪ বিলিয়ন ডলারের সাহায্য প্যাকেজ। রাশিয়ার অন্য মন্ত্রীরা ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল বিশ্বের অন্যান্য ধনী দেশগুলোর উদ্দেশ্যে। বুভুক্ষু মস্কো হঠাৎ দেখল দোকান-ভরা খাবার। অন্যরকম খাবারেও দোকান তখন ভর্তি। যে খাবার আগে কখনো সোভিয়েত ইউনিয়নে ছিল না– সেটা হচ্ছে পর্নোগ্রাফি।

রাশিয়ার নতুন বাজারে বিদেশি পণ্যের ছড়াছড়ি। বিক্রেতারাও নতুন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীরত্ব পদক বিক্রি করছেন জাতীয় বীরেরা– বেঁচে থাকার জন্য, রুটির তাগিদে। এদেরই পাশাপাশি গড়ে উঠেছে আর একটা শ্রেণি। ডামাডোলের বাজারে রাতারাতি তারা ফুলে-ফেঁপে উঠেছে। খোলাবাজারের দৌলতে তাদের অবৈধ উপায়ে অর্জিত কালো রুবল সাদা হয়ে গেল, তারপর পরিণত হলো সবুজ মার্কিন ডলারে। ছিল বিড়াল, হয়ে গেল রুমাল। এমন ভোজবাজি শুধু বিকৃত পুঁজিবাদেই সম্ভব।

কিন্তু এ তো শুধু রাশিয়ার একার পরিবর্তন নয়। রাশিয়া তো শুধুমাত্র একটা দেশ আর একটা ভূগোল ছিল না। রাশিয়া ছিল বিশ্বের সব প্রান্তের শোষিত মানুষের মুক্তির প্রতীক। সারা বিশ্বের শোষিত-নিপীড়িত আর লাঞ্ছিত মানুষ তো

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

একটাই স্বপ্ন দেখত যে রাশিয়ার মতো সমাজতান্ত্রিক সমাজে উপনীত হতে পারলে তারা মুক্তি পাবে পুঁজির দাসত্ব থেকে। এখন তাদের সামনে ধ্রুবতারা হয়ে জ্বলবে এমন কোনো মানচিত্র রইল না।

কিন্তু একথা মানতে রাজি নন সন্তোষ মৈত্র। তাঁর পরিষ্কার কথা– রাশিয়া থাকল কি না, বা চীন থাকল কি না, তা দিয়ে এদেশের গরিব মানুষের কিছু এসে যায় না। রাশিয়া নাই বলে এদেশের মানুষ মুক্তির পথ খুঁজবে না?

সন্তোষ মৈত্রের কাছে এলে মনা মাস্টার চৈত্রের মাঠে হাঁটার সময় বটগাছের ছায়া দেখতে পাওয়ার মতো প্রশান্তি পায়। আশি বছরের কাছাকাছি বয়স। জরার ছোবল সর্বাঙ্গে। প্রায় কিশোর বয়সে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়ে আন্দামান খাটা, যৌবনের প্রায় পুরো সময়টাই আন্ডারগ্রাউন্ডে কেটেছে কারণ কমিউনিস্ট পার্টি তখন ছিল নিষিদ্ধ। সারা জীবন পুলিশের অত্যাচার আর নিজের জীবনের অনিয়মের খেসারত দেওয়া শুরু হয়েছে বার্ধক্যে পৌঁছে। কিন্তু কুছ পরোয়া নেই। কাজ বন্ধ হয়নি একদিনের জন্যও। চোখে ছানি কাটার পরে এখন মোটামুটি ভালো দেখেন, তবে অপুষ্টি আক্রান্ত শরীরের সাথে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে থাকা হাঁপানি তাঁকে মাঝে মাঝেই হাসপাতালে পাঠায়। কিন্তু ফিরে এসেই যথারীতি স্কুল নিয়ে পড়েন। নিজের বাড়িতে স্কুল বসিয়েছেন প্রায় পঁচিশ বছর আগে। শুধু গরিব মানুষের ছেলেমেয়েরা পড়তে আসে। বিয়ে করেননি, তাই নিজের উত্তরাধিকার বলতে কেউ নেই। বাড়িসহ বাকি জমিজমা সব লিখে দিয়েছেন স্কুলের নামে। নিজের জন্য রেখেছেন শুধু আট হাত বাই বারো হাত একটা ঘর। সেটুকুও স্কুলের সম্পত্তিতে পরিণত হবে তাঁর মৃত্যুর পরে। ভাইপো-বোনপোরা ইন্ডিয়ায়। তারা সেখানে নিজ নিজ জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত। তারা চায় সন্তোষ মৈত্র চলে আসুন তাদের কাছে। কিন্তু তিনি রাজি নন। এমনকি চিকিৎসার কথা বলেও তাঁকে একবারের জন্যও ভারতে নেওয়া সম্ভব হয়নি। তাঁর ভয়, একবার গেলে হয়তো আত্মীয়রা তাঁকে আর ফিরতে দেবে না। কথায় কথায় সত্যেন সেন আর রণেশ দাশগুপ্তের উদাহরণ টানেন– আরে উনাদের মতো ডাকসাইটে মানুষই ফিরতে পারলেন না। আমার মনের জোর নিশ্চয়ই উনাদের চেয়ে বেশি নয়। আমি বাবা ওখানে গিয়ে বিপদে পড়তে রাজি নই কোনোমতেই। আর কয়টা দিনই বা বাঁচব! নিজের মাটিতেই শেষ নিঃশ্বাসটুকু নিতে চাই।

তাহলে এখন আমরা কী করব কাকা? মিনমিন করে জিজ্ঞেস করে মনা মাস্টার।

কী করবি মানে! কাজ কি আর কম আছে? কাজ করতে চাইলে কি কেউ তোর হাত-পা বেঁধে ফেলতে আসছে?

তা নয়। কিন্তু পার্টির কী অবস্থা তা সঠিকভাবে না জেনে কাজ করি কীভাবে বলেন!

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সেকথা ঠিক আছে। এখন একটা ভাংচুরের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে বটে পার্টি। কিন্তু এই অবস্থা তো আর চিরকাল থাকবে না। আর পার্টিও নিশ্চিহ্ন হবে না।

সেটা এত জোর দিয়ে বলছেন কীভাবে?

কোনটা?

এই যে বললেন পার্টি নিশ্চিহ্ন হবে না!

সন্তোষ মৈত্র যেন গাধা ছাত্রের কবলে পড়েছেন এমন ভঙ্গিতে বললেন– আরে দেশ থেকে কি শোষণ-পীড়ন সব উঠে গেছে? গরিব মানুষের সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে? মানুষ অশিক্ষা, অনাহার ও অস্বাস্থ্য থেকে মুক্ত হয়ে গেছে? নিশ্চয়ই হয়নি। তাহলে যতদিন এসব না হচ্ছে ততদিন তো কমিউনিস্ট পার্টি থাকবেই। গরিব মানুষ তাদের নিজেদের পার্টিকে টিকিয়ে বাঁচিয়ে রাখবেই। হতে পারে হয়তো তার নাম কমিউনিস্ট পার্টি থাকবে না। হয়তো অন্য কোনো নাম হবে নতুন যুগের পার্টির। কিন্তু সেটা কমিউনিস্ট পার্টিই থাকবে।

দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে মনা মাস্টারের– কী করে বলি কাকা, নেতারা যে যেদিকে পারছে দল ছেড়ে ছুট লাগাচ্ছে। যাদেরকে এত বড়ো মাপের মানুষ বলে ভেবে এসেছি এতদিন, যাদের মুখ থেকে কথা শোনামাত্র কোনো প্রতিবাদ ছাড়া কাজে লেগে গেছি, ভেবেছি প্রতিমুহূর্তে বিপ্লবকে তাঁরা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, তারা যে এত সুবিধাবাদী আর মানুষ হিসেবে এত ছোটো মাপের, জানার পরে নিজের ওপর থেকেই বিশ্বাস উঠে যায় কাকা!

ও! শুধু এটাই চোখে পড়ল! আর গত সত্তর বছর ধরে লক্ষ লক্ষ সোনার মতো মানুষ যে কমিউনিস্ট পার্টির ডাকে মানুষের মুক্তির জন্য জীবনপাত করে দিল, নিজেদের জীবনকে বলিদান করল, সেসব এখন আর তোর মনে পড়ছে না! মনে পড়ছে না তেভাগার কথা, ইলা মিত্রের কথা! মনে পড়ছে না শত শত আন্দোলনের কথা। বেশিদূর যাওয়ার দরকার নেই। ধর এই পাকিস্তান আমলের কথা। রংপুর অঞ্চলে তেভাগা নিয়ে কী আন্দোলনটাই হলো। ছয়েরউদ্দিন আহমদের কথা শুনেছিস? এখনও তো মনে হয় বেঁচেই আছে।

আমতা আমতা করে মনা মাস্টার– কিন্তু মানুষ কি আর পার্টির ডাকে সাড়া দেবে? আমাদের বর্তমান নেতাদের যে চরিত্র তারা দেখল!

আরে সেই কথাই তো বলছি। মানুষের জন্য কাজ করলে মানুষ সাড়া দেবে না কেন? ঐ যে বলছিলাম ছয়েরউদ্দিনের কথা। পাকিস্তান আমলে প্রথম কমিউনিস্ট পার্টি শ্যামপুরে প্রকাশ্য সভা করছে কৃষক সমিতির ব্যানারে। তখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কেবল পাকিস্তান হয়েছে। তার মানে বুঝতে পারছিস উন্মাদনাটা কেমন ছিল। সেই সময় সভা ভাবা যায়! করছে কে? না ছয়েরউদ্দিনের নেতৃত্বে কৃষক সমিতি। সভার উদ্দেশ্য দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদ জানানো। শ্যামপুরের ভীমের গদার মাঠে সভা। পাশে বেশ ঘন শালবন।

সভার দিন সভা আরম্ভ হওয়ার আগেই এসে হাজির পুলিশের দল। কী, তারা বলে সভা করা বেআইনি। যারা সভা ডেকেছে, পুলিশ ধরে নিয়ে যাবে তাদের। সুধীর মুখার্জি আর ছয়েরউদ্দিন বাধ্য হয়ে তখন পাশের শালবনের মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে। অপেক্ষা করে লোকজমায়েতের। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের কাছে খবর গেল যে মাঠ লোকে ভরে গেছে। গ্রামবাসী সব প্রস্তুত। ওরা দুইজন এসে অবাক হয়ে দেখে গ্রামের সমস্ত মহিলারা তখন পথে বেরিয়ে এসেছে। ঐ এলাকার মহিলারা খুবই পর্দানশিন। এহেন মহিলারা পথে বেরিয়ে এসেছে! তাদের হাতে হাতে লাঠি, ঝাঁটা। মানে অস্ত্র হিসেবে যে যা পেয়েছে সঙ্গে করে এনেছে। কারণ? কারণ তারা নিজেরাই বলে– তোমরা আমাদের নিজেদের ছেলে। নিজেদের লোক।

সভা শুরু হয়ে যায়। পুলিশের দল এগিয়ে আসে নেতাদের ধরতে। কিন্তু মানুষ উলটো ঘিরে ফেলল পুলিশদের। একটা পুলিশের বন্দুক থেকে গুলি বেরিয়ে লাগল কপিজউদ্দিন নামে একজন সমিতি সদস্যের গায়ে। সঙ্গে সঙ্গে জনতা মারমুখী– গুলি করলে ক্যানে জবাব দাও! ওরা কি বেআইনি কাজ করেছে? জিনিসের দাম যে বেড়েছে সেই কথাটাও আমরা বলতে পারব না?

ভয়ের চোটে পুলিশদের হাত থেকে ততক্ষণে বন্দুক-রাইফেল মাটিতে পড়ে গেছে। পুলিশ আর জোতদারদের তখন কান ধরে উঠবস করানো হলো। তারপর– যাও ভাগো নিজ নিজ হাতিয়ার নিয়ে বিদায় হও!

তার মানে বুঝলি, তুই যদি মানুষের বিশ্বাস অর্জন করতে পারিস, মানুষ তোর পাশে আসবেই।

মনা মাস্টার বলে– সেই কথাটাই তো বলছি! নেতাদের কাণ্ড দেখে মানুষ কি আর আমাদের বিশ্বাস করবে?

অনেকক্ষণ কথা বলে সন্তোষ মৈত্র একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। কিছুক্ষণ চোখ বুজে থেকে বললেন– দ্যাখ, তোর কেন্দ্রীয় কমিটির নেতারা থাকে ঢাকায়। এখানকার মানুষদের থেকে তারা অনেকদূর। মানুষ হয়তো তাদের নাম শুনেছে, বড়োজোর ছবি দেখেছে। কিন্তু এলাকার মানুষজন চেনে তোকে। তোর কেন্দ্রীয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কমিটির নেতারা নয়, এই এলাকার মানুষদের কাছে কমিউনিস্ট পার্টি মানে তুই আর তোর সাথিরা। তোদের ইমেজই হচ্ছে পার্টির ইমেজ।

তাহলে আপনি কী করতে বলেন?

পরিস্থিতি ভালো করে খেয়াল কর। পার্টির কাজ মানে তো খালি মিটিং-মিছিল করা নয়। নিজেদের মধ্যে যতটা পারিস যোগাযোগ রেখে চলবি। আর মনে মনে পথ খোঁজ। যে খোঁজে সে ঠিক পথ পেয়ে যায়।

১৩

চন্দনের কাছে সন্তোষ মৈত্রকে মনে হয় চলন্ত এনসাইক্লোপিডিয়া। কাছ থেকে কাকে দেখেনি সন্তোষ মৈত্র? সেই মুজফ্‌ফর আহমদ থেকে জ্যোতি বসু, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে সুভাষ মুখোপাধ্যায়, গোপাল হালদার থেকে গোলাম কুদ্দুস– সবাই ছিল তার ঘনিষ্ঠ। সন্তোষ দাদুর কাছে গেলে সে-ও মনা মাস্টারের মতোই চৈত্রের দুপুরে বটগাছের ছায়ায় আশ্রয় নেওয়ার অনুভূতিটা পায়।

আর কতজনের গল্পই না শোনা যায়! খুব অল্পদিনেই বামপন্থার সাথে যুক্ত হয়ে অসংখ্য অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাওয়ার সুযোগ হয়েছে চন্দনের। সেই কারণে নিজেকে ভাগ্যবানই মনে হয়। কত অসংখ্য প্রতিভাবান মানুষ এই রাজনীতির সাথে জড়িয়ে কত উজ্জ্বল সব অবদান রেখে গেছেন! কারও কারও জীবনের ঘটনা তো রূপকথার মতো মনে হয়! সন্তোষ দাদু তাদের কথা এত জীবন্ত করে বলতে পারে!

তাদের সময় কত কসরত করে মিছিল বের করত, সেইসব হাসির গল্পও বলে সন্তোষ দাদু। এক জায়গার মিছিলের কথা বলতে গিয়ে নিজেই হো হো করে হাসছিল দাদু। গল্পটা গোলাম কুদ্দুসের। তিনি তখন পার্টি এবং ট্রেড ইউনিয়নের কাজ করতেন খিদিরপুরে ডক শ্রমিকদের মধ্যে। ডকের খুব কাছেই ছিল বেশ্যাপল্লি। তারা সেজেগুজে দাঁড়িয়ে থাকত রাস্তার ধারে। ইশারায় ডাকত খদ্দেরদের। কখনো কখনো সরাসরিই ডাকত। এমনকি হাত ধরেও টান দিত। তো কুদ্দুস ভাইরা অনেক ধরে-বেঁধে হয়তো একটা মিছিল বার করলেন। মিছিল যেই বেশ্যাপল্লির কাছে পৌঁছল, দেখা গেল অর্ধেকের বেশি মিছিলকারী হাওয়া! গোলাম কুদ্দুস এ নিয়ে সিনিয়রদের কাছে খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করলেন। তারা বললেন– এখন তো কিছু লোক মিছিলে থাকে। আমরা যখন শুরু করি, বেশ্যাপল্লির কাছে এলে একজনও থাকত না। সবাই ঢুকে পড়ত কোনো না কোনো মেয়ের ঘরে। লেগে থাকো। এর মধ্যেই কাজ করতে হবে তোমাকে। পার্টির নির্দেশ। না থেকে উপায় কী! পরে সেই ডকশ্রমিকদের নিয়েই অসাধ্য সাধন করেছিলেন গোলাম কুদ্দুসরা। অনেক বড়ো বড়ো সফল আন্দোলন করেছিল ডকশ্রমিকরা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

গোলাম কুদ্দুসের কথায় একটু নড়েচড়ে বসে চন্দন। শুনতে চায় তাঁর কথা। জিগ্যেস করে– গোলাম কুদ্দুস নাকি খুবই অ্যাগ্রেসিভ আর মিলিট্যান্ট ছিলেন?

তা ছিল। স্বীকার করেন সন্তোষ মৈত্র– সেই সময় পার্টির মধ্যে খুব একবর্গা ছিল গোলাম কুদ্দুস আর সরোজ দত্ত। সরোজ দত্ত তো পরে নকশাল হয়ে গেল। মারাও পড়ল পুলিশের গুলিতে। তবে গোলাম কুদ্দুস শেষ পর্যন্ত মূল পার্টির সাথেই ছিল। একা একা মার্কসবাদ পড়েছিল গোলাম কুদ্দুস। কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হওয়া তখন যেকোনো সচেতন তরুণের কাছে বিরাট এক স্বপ্ন। তারা বিভিন্নভাবে খোঁজখবর নিয়ে নিজেরা যুক্ত হতো পার্টির বিভিন্ন উইং-এর সাথে। গোলাম কুদ্দুসকে পার্টি নিজেই ডেকে এনেছিল। তবে পরীক্ষা নিয়েছিল তারও।

কেমন পরীক্ষা?

কুদ্দুসের কাছেই শুনেছি। একদিন তিনজন ছেলে এলো তার সঙ্গে দেখা করতে। কী দরকার? তারা বলল যে, 'আপনাকে আমরা মুসলিম অ্যাসোসিয়েশনের কাজে পেতে চাই।' গোলাম কুদ্দুস উত্তরে জানিয়ে দিল যে ঐসব কাজ করতে সে রাজি নয়। উলটো সেই তিন তরুণকে সে বলল যে ঐসব বাজে সংগঠনে থেকে তোমরা নিজেদের সম্প্রদায়ের কোনো উপকার করতে পারবে না। পারলে গিয়ে কমিউনিস্ট পার্টি কর। কয়েকদিন পরে তারা এসে জানাল যে, তাদেরকে নাকি কমিউনিস্ট পার্টি থেকেই পাঠানো হয়েছে। এভাবে পরীক্ষা নেওয়াতে খুবই প্রেস্টিজে লেগেছিল গোলাম কুদ্দুসের। তাই পুরো দেড় বছর সে পার্টি অফিসে যায়নি। বারবার ফিরিয়ে দিয়েছে পার্টির আহ্বানকে। অবশেষে সেই তিন তরুণ একদিন খুব অসহায় মুখ করে এসে বলল যে, আজ গোলাম কুদ্দুসকে পার্টি অফিসে নিয়ে যেতে না পারলে পার্টিতে তাদের মুখ দেখানো কঠিন হয়ে পড়বে। সেদিন গেল কুদ্দুস।

পরে সে হয়েছিল পার্টির হোলটাইমার। 'স্বাধীনতা' পত্রিকার জন্য সারা দেশ ঘুরে [illegible] রিপোর্ট করেছে কুদ্দুস। তার রিপোর্টগুলো বাদ দিলে [illegible] লেখাই সম্ভব নয়।

[illegible] প্রতি নিবেদনের বিন্দুমাত্র কমতি ছিল না গোলাম কুদ্দুসের। সেইসময় পার্টির হোলটাইমাররা মাসিক ভাতা পেত তিরিশ টাকা। তখন অবশ্য হোলটাইমার বলা হতো না। বলা হতো পেশাদার বিপ্লবী। নিতান্তই গরিবি হালে থাকা-খাওয়ার খরচ চলে যেত কুড়ি টাকায়। বাকি দশ টাকায় আর সবকিছু করতে হতো। সেইসময় অল ইন্ডিয়া রেডিয়োতে প্রতি সপ্তাহে একবার অনুষ্ঠান করত গোলাম কুদ্দুস। প্রতিটি অনুষ্ঠানের জন্য পঁচিশ টাকা। মাস গেলে হাতে আসত একশ টাকা। সেই একশ টাকা পার্টির ফান্ডে দিয়ে দিত সে। একবার তার খুব ইচ্ছা হলো একটা ঘড়ি কেনার। বলল, এই মাসে রেডিয়ো থেকে পাওয়া টাকাটা সে পার্টি ফান্ডে দেবে না। নৃপেন চক্রবর্তী

 দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

শুনে বললেন– 'তুমি পার্টির প্রাপ্য থেকে পর্টিকে বঞ্চিত করতে পার না। জানো এখনও কত কমরেড খেতে পায় না দুবেলা!'

ব্যস, আর হাতঘড়ি পরা হয়নি গোলাম কুদ্দুসের।

অনেক লেখালেখি করেছেন গোলাম কুদ্দুস। কবিতা, গল্প, উপন্যাস। আর রিপোর্টাজ তো অসংখ্য। কিন্তু আমরা সবসময় তাঁর কবিতার যে পঙ্‌ক্তিগুলো পাঠ করতাম সেটি ছিল ইলা মিত্রকে নিয়ে লেখা

ইলা মিত্র কৃষকের প্রাণ!
ইলা মিত্র ফুচিকের বোন!
ইলা মিত্র স্ট্যালিননন্দিনী!
ইলা মিত্র তোমার আমার
সংগ্রামের সুতীক্ষ্ণ বিবেক।

শিল্পী হেমাঙ্গ বিশ্বাসের কথা একটু বলেন।

চন্দনের এই অনুরোধে একটু ছায়া ঘনায় সন্তোষ মৈত্রের চোখে। কণ্ঠে একটু গাঢ়তা আসে। বলেন– বিপ্লবের জন্য নিবেদিত অসাধারণ একজন শিল্পী। কিন্তু আফসোস, পার্টি তাঁকে ধরে রাখতে পারেনি!

কেন?

সেই উত্তর তো হেমাঙ্গ বিশ্বাসের জীবনের মধ্যেই আছে। আর আছে পার্টির বিভক্তি এবং অনেকগুলো ভুলের খেসারত।

হেমাঙ্গ বিশ্বাস শুধু গান করার জন্য গান করেননি, গান বাঙ্কার জন্য গান বাঙ্কেননি সে কথা সবাই জানে। অন্তত শিল্পীখ্যাতি অর্জনের মাধ্যমে 'করে খাওয়া'র মধ্যবিত্তসুলভ লুম্পেন মানসিকতা তাঁকে কোনোদিনই আচ্ছন্ন করতে পারেনি। কারণ তিনি গানের জন্য গান করেননি, করেছেন বিপ্লবের জন্য। সেই নিরিখে বিচার করলে হেমাঙ্গ বিশ্বাসই আমাদের একমাত্র বড়ো শিল্পী যিনি তাঁর গান বা সৃজিত শিল্প বিক্রি করেননি। অথবা বলা যায়, শিল্পের নামে নিজেকে বিক্রি করেননি। এই কথাটা বলা যত সহজ, কাজে পরিণত করা যে কত কঠিন তা সবচেয়ে ভালো বলতে পারেন তাঁরাই যারা নিজেদের বিক্রি করতে শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েছেন।

সিলেটের হবিগঞ্জের ছোটোখাটো জমিদার অথবা বড়োসড়ো জোতদার পরিবারের সন্তান হেমাঙ্গ বিশ্বাস শিল্পীজীবনের শুরুতেই পিতৃপরিবার থেকে বহিস্কৃত হলেন। অপরাধ তাঁর শিল্প এবং রাজনীতি। এটুকু অন্তত ধারণা করা যায়, রাজনীতিটা না করলে শুধু শিল্প তথা গণসংগীতের জন্য হয়তো তাঁকে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হতো না। আবার কমিউনিস্ট পার্টি যে তাঁকে খুব

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ভালোভাবে মূল্যায়ন করেছে, বা তাঁর প্রতি সুবিচার করেছে– এমনটিও বলা যাবে না। কারণ ঐ একটাই। হেমাঙ্গ বিশ্বাস সবসময় পার্টিলাইনের সঙ্গে একমত হতে পারতেন না। প্রতিমুহূর্তে মিলিয়ে নিতে চাইতেন নিজের ও নিজেদের কার্যক্রম মতাদর্শ এবং মানবমুক্তির সংগ্রামের সাথে হাত ধরাধরি করে চলছে কি না। জীবনের শেষ পর্বে এসে যে কমিউনিস্ট পার্টির সকল অংশের সঙ্গে নিজের সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন, তার কারণও ছিল পার্টির লাইনকে মানবমুক্তির সহায়ক মনে না করে অন্তরায় মনে করা। পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম এবং বামফ্রন্ট যখন সংসদীয় রাজনীতির মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করল, তখন সুবিধার হালুয়া-রুটির লোভে অনেকেই নিজ নিজ ক্ষোভ চেপে রেখে ওপরে ওপরে পার্টির সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলেছিলেন। কিন্তু হেমাঙ্গ বিশ্বাস পারেননি নপুংসকদের কৌশল গ্রহণ করতে। কারণ সেই ১৯৫৫ সাল থেকেই তিনি প্রকাশ্য মঞ্চে বলে আসছিলেন যে পার্টি তথা শিল্পীদের যে প্রধান সমস্যা তা হচ্ছে আদর্শগত দুর্বলতা। সেই আদর্শগত দুর্বলতার কারণ আবার আমাদের দেশের সংস্কৃতির ইতিহাস এবং আমাদের ঐতিহ্যের ধারা সম্পর্কে আমাদের শিল্পীদের অজ্ঞতা।

সেইসাথে পার্টির প্রতি কিছুটা অবিশ্বাসও তাঁর ছিল।

ঘোষণাপত্রে, মুখে এবং স্লোগানে বিপ্লবের কথা বললেও, হেমাঙ্গ বিশ্বাসের মনে এই সন্দেহ ঢুকে পড়েছিল যে কমিউনিস্ট পার্টি বিপ্লবের ব্যাপারে ঠিক আন্তরিক তো নয়ই, কিছুটা যেন ভীতও। ব্রিটিশ আমলের শেষদিকে মুম্বাইয়ের নাবিক-বিদ্রোহ সংঘটিত হলো। 'খাইবার' নামক ক্রুজারের নৌসেনারা বিপ্লবের পতাকা তুলে ধরলেন। তাঁদের সাথে যোগ দিল মুম্বাইসহ বিভিন্ন অঞ্চলের শ্রমিক। কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন নেতৃত্বের ভূমিকা, হেমাঙ্গ বিশ্বাসের মতে, ছিল পুরোপুরি বিশ্বাসঘাতকতার। বিপ্লবী নাবিকরা কমিউনিস্ট পার্টিকে আহ্বান জানালেন এই বিদ্রোহের মাধ্যমে শুরু হওয়া বিপ্লবের নেতৃত্ব গ্রহণের। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা সাহস পাননি। তাঁরা নাবিক-শ্রমিকদের আহ্বান উপেক্ষা করে তাদের বললেন কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের কাছে যেতে। হেমাঙ্গ বিশ্বাস তাঁর স্মৃতিচারণায় তীব্র শ্লেষের সাথে উল্লেখ করেছেন সেই সময়ে কমিউনিস্ট পার্টির অফিসে মার্কস-লেনিনের ছবির পাশাপাশি গান্ধি-জিন্না-নেহরুর ছবি টাঙিয়ে রাখার কথাও। হেমাঙ্গ বিশ্বাস লিখেছিলেন– 'নীল সমুদ্র লাল করে গেল/নাবিকের রক্তধারা/তারাও তো শুনেছে আমাদের ডাক/তারাও তো দিয়েছে সাড়া।' কিন্তু বেদনাহত হেমাঙ্গ বিশ্বাসের মতো হাজার হাজার পার্টিকর্মী অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে দেখলেন বিপ্লবের আহ্বানে সাড়া দিতে তাঁদের পার্টিনেতৃত্বের সুস্পষ্ট অনীহা।

তেলেঙ্গানা-কাকদ্বীপের কৃষক অভ্যুত্থান এদেশের শ্রমজীবী মানুষকে মুক্তির পথ দেখিয়েছিল। সেই অভ্যুত্থানের পবিত্র আগুনকে নিজে নিজে নিভিয়ে দিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কমিউনিস্ট পার্টি নিজেদের মধ্যে শুরু করেছিল কাপুরুষতা এবং সংশোধনবাদের জয়যাত্রা। কিন্তু হেমাঙ্গ বিশ্বাসের পরিণত বয়সের বিশ্লেষণ জানাচ্ছে যে পার্টির মধ্যে আপসকামিতা ও দোদুল্যমানতা অনেক আগে থেকেই বিস্তৃত হচ্ছিল। হেমাঙ্গ বিশ্বাসের কাছে মনে হয়েছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে পার্টি যে ভূমিকা পালন করেছে, তা কোনো আত্মমর্যাদাসম্পন্ন পার্টির কাছ থেকে আশা করা যায় না। সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথে আন্তর্জাতিকভাবে যুদ্ধের চরিত্র বদলে গিয়েছিল, এ ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই। কিন্তু যেহেতু সোভিয়েত ইউনয়ন মিত্রশক্তির সঙ্গে মিলে যুদ্ধ করছিল, তার ফলে এই দেশে পার্টি ব্রিটিশদের বিরোধিতা বন্ধ করে তার পক্ষে প্রচারণা শুরু করে দেবে এমনটি আশা করতে পারে না কেউই। কিন্তু সেটাই ঘটেছিল। জার্মানি বা জাপানের বিরোধিতায় দেশজাগানোর মন্ত্র প্রচার করে চললেও দুইশ বছরের ঔপনিবেশিক প্রভু ব্রিটেনের বিরোধিতা বন্ধ করে দিয়েছিল কমিউনিস্ট পার্টি। পৃথিবীর অন্য দেশের পার্টির মতো সশস্ত্র গণবাহিনী গঠন করে, নিজেদের উদ্যোগ সম্পূর্ণ বজায় রেখে ফ্যাসিবিরোধী যুদ্ধপ্রয়াসের সহায়তা করার বদলে পার্টি পুরো উদ্যোগ তুলে দিল ব্রিটিশের হাতে, আর নিজেরা হয়ে পড়ল ব্রিটিশের লেজুড়। সেই সময় সারাভারতব্যাপী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। পার্টি নিজেকে সেই জোয়ার থেকে সরিয়ে তো রাখলই, উপরন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী কর্মকাণ্ডকে 'পঞ্চম বাহিনী'র ষড়যন্ত্র বলে প্রচারণা চালাল। সেই সময় যে গানই লেখা হোক না কেন, তাতে পার্টির নির্দেশে 'লিংক আপ' কিংবা 'ওয়ে আউট' দিতে হতো। তার অন্য নাম শ্রেণিদ্বন্দ্বের পরিবর্তে শ্রেণি সহযোগিতা। সেই ধারায় গান লিখতে বাধ্য করা হয়েছে খোদ হেমাঙ্গ বিশ্বাস এবং সত্যেন সেনদেরও। স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে নিজেদের অবস্থান পেছনে রেখে কমিউনিস্ট পার্টি তখন বারবার রোবটের মতো আহ্বান চালিয়ে যাচ্ছে কংগ্রেস-লীগ একতার। (এই প্রসঙ্গে মনে পড়বেই যেকোনো জাতীয় সমস্যায় আমাদের দেশে তথাকথিত সুশীল সমাজের মতো বামদলগুলোও জপ করতে থাকে দুই নেত্রীর একত্রিত হওয়ার আহ্বানমন্ত্র)। ১৯৪২-৪৩ সালে কমিউনিস্ট পার্টি সারা দেশজুড়ে গান গেয়ে বেড়াচ্ছে– তোরা আয়, আয়রে ছুটে আয়–/এ ভারতের হিন্দুমুসলিম কে আছ কোথায়/স্বাধীন হাওয়া লাগল পালে স্বরাজের নৌকায়/কংগ্রেস-লীগ এক হয়ে ভাই সেই তরণী বায়।

কমিউনিস্ট পার্টি বলছে শুধু কংগ্রেস আর মুসলিম লীগের কথা। নিজেদের নাম নিজেরাই নিচ্ছে না। শুধু তাই নয়, মুসলমানদের আত্মশাসনের নামে পাকিস্তান প্রস্তাবকেও প্রকারান্তরে সমর্থন জানাচ্ছে। আবার দেশভাগের আগে আগে সিলেট অঞ্চলকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষে প্রচার চালাচ্ছে। কারণ, পার্টির নেতারা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ধারণা করছেন যে ভারতে হিন্দু-মুসলিম জনতার, বিশেষ করে হিন্দুর, গণতান্ত্রিক অধিকার পাকিস্তানের তুলনায় অনেক বেশি বিরাজমান থাকবে।

সন্দেহ নেই, কমিউনিস্ট পার্টির ডান বিচ্যুতির প্রতিবাদ করতে করতে হেমাঙ্গ বিশ্বাস নিজেও মাঝে মাঝে বাম বিচ্যুতির শিকার হয়েছেন। এই কারণেই পার্টির ভাঙনের পরে সিপিএমকে সমর্থন করা, সিপিএম সংসদীয় রাজনীতিতে যোগ দিলে তা থেকে বেরিয়ে আসা এবং পরবর্তীতে নকশালবাড়ি-অভ্যুত্থানকে সমর্থন করার মতো ঘটনা ঘটেছে তাঁর জীবনে। শেষ জীবনে পার্টির কোনো অংশের সাথেই থাকেননি। কারণ তিনি মনে করতেন পার্টিগুলো বিপ্লব করতে তো চায়ই না, উলটো-- বিপ্লবকে ভয়ই পায়। চীনে বহুল প্রচলিত একটি গল্পকে উদ্ধৃত করতেন তিনি--

> একসময় চীনের এক রাজা ড্রাগনের খুব ভক্ত ছিলেন। তিনি তাঁর রাজ্যের সর্বত্র ড্রাগনের ছবি আঁকতে বলতেন। আর রাজবাড়িতে তো কথাই নেই। রাজবাড়ির দরজা-জানালা-দেওয়ালে শুধু ড্রাগনেরই ছবি। একরাতে আকাশপথে উড়ে যেতে যেতে ড্রাগন ভাবল, রাজা যখন তার এত বড়ো ভক্ত, তখন তার অন্তত একবার রাজাকে দেখা দেওয়া কর্তব্য। সে নেমে এলো রাজার শোয়ার ঘরের কাছে। রাজা তখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন। রাজার ঘর বিশাল বটে, কিন্তু ড্রাগনের শরীরের তুলনায় সেটি কিছুই নয়। ড্রাগন কোনোমতে নিজের লেজটিকে জানালা দিয়ে রাজার ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে সকালের অপেক্ষা করে রইল। সকালে ঘুম ভেঙে রাজা ড্রাগনের লেজ দেখেই ভয়ে অজ্ঞান। জ্ঞান ফিরলেই আবারও অজ্ঞান। মাথায় পানি-টানি ঢেলে জ্ঞান ফেরাতে না ফেরাতেই আবারও অজ্ঞান।

হেমাঙ্গ বিশ্বাস খুলে বলতেন না যে ড্রাগনকে বিপ্লবের জায়গায় এবং রাজাকে কমিউনিস্ট পার্টির জায়গায় কল্পনা করে নিতে হবে।

সায় দেয় চন্দন-- ঠিকই তো!

জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সময়টুকু পার্টির জন্য ব্যয় করার পরে যখন সেই পার্টি-নেতৃত্বের প্রতি আস্থা টলে যায়, তখন আর একজন মানুষের নিজের অবলম্বন বলতে থাকেটা কী? এমন ঘটনা ঘটেছে লক্ষ লক্ষ পার্টি-কমরেডের জীবনে। হেমাঙ্গ বিশ্বাসের মতো সৃষ্টিশীল মানুষের তবুও তো একটা অবলম্বন থাকে। তাঁর ছিল গান। হাঁপানি রোগ কিংবা ফুসফুসের যক্ষ্মা তাঁর গানকে কেড়ে নিতে পারেনি। কিন্তু রাজনীতিশূন্যতা যত তীব্রভাবে আক্রমণ করেছিল তাঁর গানকে, সেই আক্রমণ যেকোনো রোগের তুলনায় অনেক বেশি ক্ষতিকারক। তবু হেমাঙ্গ বিশ্বাসের সঙ্গী ছিল গণসংগীত। ততদিনে বাংলাদেশ তো বটেই,

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সারা ভারতবর্ষেই গণসংগীতের সঙ্গে পরিপূরকভাবে উচ্চারিত হতে শুরু করেছিল হেমাঙ্গ বিশ্বাসের নাম। গণসংগীতকে তিনি বিপ্লবের হাতিয়ার বলে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন। আর সে কারণে তাঁকে গণসংগীতের সঠিক চরিত্র নিয়েও বিতর্কে লিপ্ত হতে হয়েছিল সমকালীন গায়ক-সংগীতকারদের সঙ্গেও। সে বিতর্ক, বলাই বাহুল্য, অমীমাংশিত আজও। শিল্পের কোনো শাখা নিয়েই যেমন কোনো শেষ কথা বলা যায় না, তেমনই গণসংগীতের বিতর্ক আজও জারি রয়েছে। হেমাঙ্গ বিশ্বাসের সাথে আমাদের সংগীতজগতের আরেক দিকপাল সলিল চৌধুরীর নান্দনিক বিতর্ক আমাদের দেশের নন্দনতত্ত্বের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দখল করে রয়েছে। হেমাঙ্গ বিশ্বাসের মতে তেলেঙ্গানা-আন্দোলনের ব্যর্থতার পরে হতাশ সলিল চৌধুরী গানের ক্ষেত্রে অতিমাত্রায় ফরমালিজমের প্রতি ঝুঁকে পড়েছিলেন। পাশ্চাত্য অর্কেস্ট্রেশনের প্রতি সলিল চৌধুরীর দুর্বলতা ছিল আগে থেকেই। সে বিষয়ে তাঁর জ্ঞান এবং দক্ষতাও ছিল প্রশ্নাতীত। কিন্তু তাঁর অতিরিক্ত ফরমালিজম-প্রীতিকে হেমাঙ্গ বিশ্বাস এই বলে নিন্দা জানিয়েছিলেন যে, সলিল চৌধুরী বাংলার গণসংগীতকে তার জাতীয় চরিত্র থেকে দূরে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন কসমোপলিটনিজম-এর দিকে। হেমাঙ্গ বিশ্বাসের এককথা, কমিউনিস্ট শিল্পীর গান হবে স্তালিনের মতের অনুসারী— 'বিষয়ের দিক থেকে আন্তর্জাতিক, আর আঙ্গিকের দিক থেকে দৈশিক।' এই সূত্র অনুসারে হেমাঙ্গ বিশ্বাস জনগণের সামনে গণসংগীত উপস্থাপনার সময় লৌকিক মাধ্যমের ওপরেই জোর দিয়েছিলেন।

পরবর্তীতে অবশ্য হেমাঙ্গ বিশ্বাস নিজের চিন্তার মধ্যে একপেশে চিন্তার ছাপ ঠিকই শনাক্ত করতে পেরেছিলেন। এবং শুধরে নিতে পেরেছিলেন নিজের চিন্তাকে যে, শক্তি কেবলমাত্র সত্যিকারের বিপ্লবী শিল্পীর মধ্যেই বিদ্যমান থাকে।

এই রাজনৈতিক এবং শিল্পের আদর্শবাদ নিয়ে হেমাঙ্গ বিশ্বাস বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন আরও অনেকের সঙ্গেই। যেমন বিজন ভট্টাচার্য। বিজন ভট্টাচার্য তাঁর 'নবান্ন' নাটকের মাধ্যমে বাংলা নাটকের জগতে বিপ্লব এনে দিয়েছিলেন। কিন্তু হেমাঙ্গ বিশ্বাস, এই নাটককে তার প্রাপ্য সমস্ত প্রশংসা প্রদান করার পরেও সমালোচনা করেন এই বলে যে, 'নবান্ন' নাটকের মধ্যেও কমিউনিস্ট পার্টির রণনীতিগত বন্ধ্যা লাইনের ছাপ পুরোপুরিই রয়ে গেছে। সেখানে শুধু দুঃখ, শুধু কান্না, আর জনগণের শত্রু বলতে এক ঐ মজুতদার। যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ দেশজুড়ে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টির জন্য দায়ী, সেই ইংরেজ শাসকের কথা নাটকে একটিবারের জন্যও উল্লিখিত হলো না। রাজনৈতিক দিক থেকে তাই তার মূল্য মোটেই বেশি হতে পারে না। হেমাঙ্গ বিশ্বাস বললেন যে, দীনবন্ধু মিত্র তো তাঁর 'নীলদর্পণ' নাটকে অন্তত

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

একজন তোরাপ চরিত্র সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন, কিন্তু 'নবান্ন' নাটকে তেমন একটি চরিত্র সৃষ্টি হতে পারেনি শুধুমাত্র ভুল রাজনৈতিক দৃষ্টির কারণে।

একই কারণে তাঁর চোখে সমালোচিত জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রও। হেমাঙ্গ বিশ্বাসের মতে, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের 'নবজীবনের গান' সুর এবং রচনা উভয় দিক থেকে এক অসাধারণ সৃষ্টি। নাগরিক সংস্কৃতিতে রূপান্তর আনার চেষ্টাটি ছিল পুরোপুরি লক্ষণীয়। এই নৃত্যনাট্যে রাগসংগীতের অপূর্ব ব্যবহারের অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন হেমাঙ্গ বিশ্বাস। কিন্তু তিনি এখানেও প্রশ্ন তোলেন রাজনীতি নিয়েই। বিজন ভট্টাচার্য এবং জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাবের ব্যাপারে বরাবরই সোচ্চার ছিলেন হেমাঙ্গ বিশ্বাস। এবং তাঁর এই পর্যবেক্ষণ যে সঠিক ছিল তা বোঝা যায় পরবর্তীতে, বিশেষ করে ১৯৪৬ সালের পরে কমিউনিস্ট পার্টি জঙ্গি আন্দোলনের লাইন গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গেই উপরিউক্ত দুজনের গণনাট্য আন্দোলন থেকে দূরে সরে যাওয়ার ঘটনায়।

একইভাবে হেমাঙ্গ বিশ্বাস তীব্র সমালোচনা করেছেন হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ভবানী সেন এবং পার্টির তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক পূরণচাঁদ যোশীরও। তাঁদের ব্যক্তিজীবন নিয়ে হেমাঙ্গ বিশ্বাসের কোনো প্রশ্ন নেই। কিন্তু তিনি আপসহীন তাঁদের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির অস্বচ্ছতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে।

তবে হেমাঙ্গ বিশ্বাস চিরকাল শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন তাঁর প্রিয় জর্জদা বা দেবব্রত বিশ্বাসের প্রতি। হেমাঙ্গ বিশ্বাসের দৃষ্টিতে দেবব্রতই একমাত্র রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী যিনি নিজে অরাবীন্দ্রিক। দেবব্রত বিশ্বাসের জীবনচর্চায় যেমন রবীন্দ্র-ঘরানা ছিল না– সংগীতেও তিনি তেমনই কোনো ঘরানায় বন্দি ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কাউকে তিনি গুরু মানতেন না। মায়ের সঙ্গে ছোটোবেলায় ব্রাহ্মসমাজে রবীন্দ্রসংগীত গেয়েছেন বটে, কিন্তু পরবর্তীতে ব্রাহ্মসমাজেরও ধার তিনি ধারতেন না। হেমাঙ্গ বিশ্বাস একটু বিদ্রুপের সুরেই জানিয়েছেন যে, প্রেম হোক, প্রকৃতি হোক আর পূজা পর্বেরই হোক– রবীন্দ্রনাথের সব গানকেই 'পেলব ঢঙ এবং এলানো ছন্দে' গাইতেন সবাই। তাই কলকাতায় প্রথম দেবব্রত বিশ্বাসের কণ্ঠে রবীন্দ্রসংগীত শুনে চমকে উঠেছিলেন হেমাঙ্গ বিশ্বাস। 'এভাবেও রবীন্দ্রসংগীত গাওয়া যায়!' হেমাঙ্গ বিশ্বাস স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে জানাচ্ছেন যে– 'ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো' কিংবা 'বাঁধ ভেঙে দাও' গাইতে গিয়ে বিশেষ বিশেষ শব্দ জর্জ বিশ্বাস এমন স্বরাঘাতে উচ্চারণ করতেন যে পুরো গানের আবহটিই পুরুষকারে ভরে উঠত ও অসম্ভব এক

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

গতিময়তা লাভ করত। তথাকথিত 'বিশুদ্ধ' রবীন্দ্রসংগীত গাইয়েরা তখন থেকেই দেবব্রত বিশ্বাসের পেছনে লেগেছিলেন। তাঁরা দেবব্রত বিশ্বাসের গায়কীকে বলতেন 'ঘুষি বাগানো রবীন্দ্রসংগীত'। কিন্তু হেমাঙ্গ বিশ্বাসের চোখে দেবব্রত-ই ছিলেন সেই শিল্পী যিনি 'রবীন্দ্রসংগীতের সবল উদ্দীপক ধারার সঙ্গে গণসংগীতকে মিশিয়ে দিলেন। রবীন্দ্রসংগীত সম্পর্কে আমাদের, অর্থাৎ গণসংগীত গাইয়েদের মনোভাবকে সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করলেন যেমন, তেমনি রবীন্দ্রসংগীতকে মোহান্তদের বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও মন্দিরের বেদি থেকে গণসংগীতের সঙ্গে প্রান্তরে নামিয়ে আনলেন। এই দুই ধারার সমন্বয়ে জর্জদা যেমন শ্রেষ্ঠ গণসংগীত শিল্পী, তেমনি শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রসংগীত গায়ক। এখানেই জর্জদার যুগান্তকারী ভূমিকা। এখানেই তিনি মহান গণশিল্পী।'

শিল্পী বা সংস্কৃতিকর্মী হিসেবে নিজেকে কোন শ্রেণিতে দেখতে চেয়েছেন হেমাঙ্গ বিশ্বাস? এই একটি প্রশ্নের মীমাংসা করার জন্যই আসলে এই রচনা। এতক্ষণে উত্তরের একটি চিত্রও বোধকরি ফুটে উঠেছে আমাদের সামনে। উপসংহারের জন্য কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যায়।

১৯৩৪-৩৫ সালে ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্তর্জাতিক লেখক-শিল্পী ব্রিগেডের সদস্য হিসেবে স্পেনে গিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন প্রগতিশীল লেখকরা। আমেরিকার হেমিংওয়ে, ইংল্যান্ডের ক্রিস্টোফার কডওয়েল, র‍্যালফ ফকস-এর মতো লেখকরা ছিলেন সেই ব্রিগেডে। ভারতবর্ষ থেকে সেই ব্রিগেডে যোগ দিতে গিয়েও আবার ফিরে এসেছিলেন মুলকরাজ আনন্দ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যুদ্ধের ময়দানে ছিলেন একজন বাঙালি সন্তান— ডা. অটল। এই ডা. অটলকেই আমরা আবারও দেখতে পাই চীন-জাপান লড়াইয়ের সময় চীনের জনগণের ন্যায়সংগত লড়াইতে মেডিকেল টিম নিয়ে পাশে দাঁড়াতে। হেমাঙ্গ বিশ্বাস সুযোগ পেলেই শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারণ করতেন ডা. অটলের নাম।

ভাওয়ালের কবি গোবিন্দ দাসকে হেমাঙ্গ বিশ্বাস অসাধারণ কবি ও ব্যক্তি বলে শ্রদ্ধা জানাতেন সর্বদাই। তাঁর মতে, গোবিন্দ দাস পুরোপুরি ইংরেজ ও ইংরেজির প্রভাবমুক্ত অত্যন্ত উঁচুদরের কবি। তিনি ভাওয়ালের রাজবাড়ির ছায়ায় বসে শোষকদের ব্যঙ্গ করে কবিতা লিখেছেন। তখন ভাওয়াল এস্টেটের ম্যানেজার কালিপ্রসন্ন ঘোষ, যিনি নিজেও কবিতা লিখতেন, তাঁর আদেশে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল গোবিন্দ দাসের ঘরবাড়ি। এই গোবিন্দ দাসই চীনে সানইয়াৎসেন-এর বিপ্লবের সময় ১৯১১ সালে প্রথম কবিতা লিখে পাঠিয়েছিলেন চীনে, সেখানকার বিপ্লবীদের অভিনন্দন জানিয়ে। দেশের তথাকথিত সুশীল মানুষদের ব্যঙ্গ করে গোবিন্দ দাস লিখেছিলেন— 'স্বদেশ স্বদেশ করিস কারে, এদেশ তোদের নয়/ এই যমুনা গঙ্গা নদী, তোদের ইহা হতো যদি/ পরের পণ্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

গোরা সৈন্যে জাহাজ কেন বয়'। কৃষকদের উদ্দেশ্য করে গোবিন্দ দাস লিখেছিলেন– 'ওই খেতে শস্য ভরা/ তোদের নয়তো একটি ছড়া/ তোরা শুধু চাষের মালিক/ গ্রাসের মালিক নয়'।

হেমাঙ্গ বিশ্বাসের আরেক প্রিয় ব্যক্তিত্ব ভাওয়ালেরই কবিয়াল হরি আচার্য। কারণ হরি আচার্যই প্রথম কবিয়াল যিনি খিস্তি আর রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাকে পাশ কাটিয়ে স্বদেশপ্রেমমূলক কবিগান লিখতে শুরু করেছিলেন।

প্রিয় ব্যক্তিত্ব গগন হরকরা। কারণ রবীন্দ্রনাথ যে সময় স্বদেশপ্রেমের গানগুলো লিখছিলেন, তখন 'গুরুদেব' রবীন্দ্রনাথও নিজের গুরুদেব হিসেবে পেয়েছিলেন গগন হরকরাকে।

আরেক প্রিয় ব্যক্তি গুরুদাস পাল। জুটমিলের শ্রমিক। লেখাপড়া তেমন জানতেন না। কিন্তু এখনকার অনেক বিপ্লবী গণসংগীতশিল্পীই চমকে উঠবেন যখন জানবেন যে 'থাকিলে ডোবাখানা হবে কচুরিপানা' গানটির রচয়িতা এই গুরুদাস পাল।

তাঁর ছিল কিংবদন্তীসুলভ জেদ। সরাসরি বলতেন– 'পার্টিতে এসেছি বিপ্লব করতে, গণসংগীত গাইতে নয়'। সেই পার্টি যখন বিপ্লব থেকে দূরে সরে যায়, তখন হেমাঙ্গ বিশ্বাস পার্টিকে ত্যাগ করেন, কিন্তু বিপ্লবকে ত্যাগ করেন না।

১৪

ক্লাস শুরু হয় এগারোটায়। বাড়ি থেকে সাড়ে দশটায় বেরোলেই চলে। গোসল সারতে সারতেই ফিরোজার ভাত ফোটানো শেষ। বেড়েও ফেলে। গরম ভাত, আলুভর্তা, মৌসুমি সবজির নিরামিষ। জুঁইফুলের মতো ভাপওঠা ভাতের উপর প্রায়ই ফিরোজা দুই চামচ ঘি ছিটিয়ে দেয়। বেশ চেকনাই হচ্ছে মনা মাস্টারের চেহারা।

আজকেও ঢেকুর তুলে সিমিকে আদর করে বেরিয়ে এলো মনা মাস্টার। অঘ্রান মাসের রোদ-ছায়ায় ধীরে সুস্থে হেঁটে স্কুলে পৌঁছাতে বড়োজোর কুড়ি মিনিট। তাদের পাড়ার শেষ মাথায় মাড়োয়ারির গুদাম, রিকশাস্ট্যান্ড, ভাতের হোটেল, কাঁচাবাজারের পরে থানা। আজ মনা মাস্টার সচকিত হয়ে দেখে থানার সামনে লোকে লোকারণ্য। এ রকম মাঝে মাঝে দেখা যায়। চাঞ্চল্যকর কোনো ডাকাতি বা অন্য কোনো আলোচিত মামলার আসামিকে ধরে আনার খবর পেলে থানার সামনে লোকের ভিড় জমে।

ভিড় দেখলে সচরাচর মনা মাস্টার দুই-এক মিনিট দাঁড়িয়ে পাশ কাটিয়ে চলে যায়। আজকেও সেভাবেই যেতে চেয়েছিল। পারল না। তার দুই পা কেউ যেন গেঁথে দিয়েছে মাটির সাথে। আর বুকটা জ্বলে উঠেছে অসহ্য ক্রোধে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পেটানো হচ্ছে খেতমজুর মকবুলকে। লকাপে নয়, থানার আঙিনায়। সাড়ে তিন ফুট উঁচু পাঁচিলের বাইরে দাঁড়িয়ে দেখছে শত শত মানুষ। পেটানো হচ্ছে সকলের সামনে। তেল খাওয়ানো পাকা রুলারের ঘা পড়ছে মকবুলের শরীরে। থানায় এনে নিরীহ মানুষকে পেটানো কোনো নতুন ঘটনা নয়। কিন্তু আজ মকবুলকে পেটানো হচ্ছে জনসমক্ষে সম্পূর্ণ নগ্ন করে। তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে খেতমজুর মকবুলের বেমানানরকম সুশ্রী বউ রহিমা। আর তাদের দুই মেয়ে। তারা কাঁদছে হাউমাউ করে। দারোগা সাইফুদ্দিনের হাতের রুলার রোদ চমকে আছড়ে পড়ছে মকবুলের কালো কেঠো শরীরে, কলজে-ছেঁড়া আর্তনাদ বেরোচ্ছে তার মুখ চিরে, মুহূর্তে উচ্চগ্রামে উঠে যাচ্ছে তার বউ-মেয়ের কান্নার শব্দ। দয়া ভিক্ষা করছে তারা দারোগার কাছে, আল্লার দোহাই দিচ্ছে তারস্বরে। দর্শকদের মধ্যে কেউ কেউ আহা রে বলে উঠছে ঠিকই, কিন্তু তা বড়ো সন্তর্পণে, যাতে শব্দ শুনে পুলিশ এটাকে প্রতিবাদ ভেবে না বসে। মনা মাস্টার নিজেও অসহায় রাগে কাঁপছে। একটা মানুষকে কেন পেটানো হচ্ছে উলঙ্গ করে; তার স্ত্রী-কন্যার সামনে, শত শত মানুষের সামনে? মনা মাস্টার অস্ফুটে নিজেকেই যেন জিজ্ঞেস করে– কী এমন অপরাধ করেছে মকবুলের মতো সাধারণ একজন খেতমজুর!

কিছুক্ষণ পরে উত্তর মেলে। সাইফুদ্দিন দারোগার কাছ থেকেই। পেটানোতে কিছুক্ষণের বিরতি দিয়ে গালাগালির তুফান ছোটায় দারোগা– খানকির বাচ্চা, এমন অপকর্ম করতি পারিস! তুই শালা একটা মানুষের বাচ্চাই না। দ্যাশে কি আইন নাই? সমাজ নাই? ধর্ম নাই?

সাইফুদ্দিন দারোগার মুখেও ধর্মকথা!

সাইফুদ্দিন দারোগা গলা আরও চড়ায়। বোঝা যায় সমবেত জনতাকে সাক্ষী মানতে চায় সে। গলা চড়িয়ে বলে– দ্যাশে অভাব নাই কার? দ্যাশের মানুষ সব্বাই কি পুলাও-কুর্মা খায়? তিনবেলাত সব্বাই কি প্যাট ভরি খাতি পায়? তাহলি! তাহলি ঘরে অভাব থাকলিই এমন পাপ করতি হবি! এতবড়ো পাপ! দ্যাশে কি ধর্ম নামে কিছু নাই?

আবার ধর্ম! বিএনপি-জামাত ধর্মজোট কি সাইফুদ্দিন দারোগাদের ঠিকাদারি দিয়েছে ধর্মের!

হারামির বাচ্চা! বউরি দিয়ে ব্যবসা করাও। ঘরডারে বেশ্যাখানা বানাও। এলাকার যুবসমাজের চরিত্র নষ্টের আনজাম-অপচিষ্টা কর।

এবার জনতার দিকে আঙুলের ইশারা করে সাইফুদ্দিন দারোগা– জানেন আপনেরা? জানেন কী করিছে এই হারামজাদা? জানলি আপনেরাও থুক দিবেন

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এই হারামজাদার মুখে। এই হারামজাদার অভাব। তা গতরডা আছে কীসের জন্যি! গতর খাটা। কাম করি খা। তা নয়, বউডারে দিয়ি ব্যবসা ফাঁদিছে। দেহব্যবসা। বেশ্যাবৃত্তি। এলাকার যুবসমাজরে নষ্ট করতিছে। কন আপনেরা, নষ্ট করতিছে না?

শত শত লোক নিশ্চুপ। জনতার মৌনতাকেই বোধহয় তার কথার সমর্থন ভেবে নেয় সাইফুদ্দিন দারোগা। তার গলা চড়ে যায় আরও। জেগে ফুলে ওঠে কণ্ঠনালি– এমন নাজায়েজি কাম, আমি সাইফুদ্দিন দারোগা, আমার এলাকায় ঘটতি দিতে পারি না। অগো আইনের বিচারে যা হওয়ার হবি, কিন্তু ধর্মের বিচারডা তো আমাদেরই করতি হবি না কি কন! ঠিক কি না?

ঠিক! অর বউ তো এখন এক নাপাক মিয়ামানুষ। বউয়ের শরীর নাপাক। তার কাফ্ফারা দিতে হবি দুইজনাক। ঐ শালার সেপাই, আন অর বউরে নিকটে আন!

একজন সেপাই বাহুমূলে ধরে টেনে আনে রহিমাকে। আর শত শত জোড়া চোখ দেখতে থাকে বস্ত্রহরণ শুরু হলো দ্রৌপদীর। সাইফুদ্দিন দারোগা একহাতে টেনে টেনে খুলতে লাগল রহিমার শাড়ি-কাপড়। রহিমা হাতজোড় করে দয়াভিক্ষা চাইছে। চেষ্টা করছে বাধা দেওয়ার। সঙ্গে সঙ্গে তার শরীরে পড়ছে রুলারের বাড়ি। এদিকে পায়ে পড়ছে মকবুল। তার গায়ে-মাথায় পড়ছে দারোগার ভারী বুটের লাথি। দারোগা সাইফুদ্দিন যথার্থই করিতকর্মা। অল্পক্ষণেই শত শত জোড়া চোখ দেখতে পেল উন্মোচিত একটা যুবতি শরীর। মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছে। দুই হাত আর পা ভাঁজ করে মাতৃজঠরে ভ্রূণের আকৃতি নিতে চাইছে একটা মাতৃশরীর।

দারোগা সাইফুদ্দিন হাঁফাচ্ছে। পরিশ্রমে নাকি কাম গোপন করার আয়াসে!

এরপর আর কী আছে?

এবার নাকি মকবুলকে নিজের জিভ দিয়ে চেটে রহিমার লজ্জাস্থানের নাপাকি দূর করতে হবে।

আর দেখতে পারছে না মনা মাস্টার। সেই অপমানিতা মাতৃমূর্তির সামনে চোখে হাতচাপা দেয়।

হঠাৎ-ই রাস্তা থেকে ছিটকে একটা তরুণ ঢুকে পড়ে থানার কম্পাউন্ডে। তার চিৎকার কাঁপিয়ে দেয় পুরো এলাকাকে– বন্ধ কর! বন্ধ কর বলছি!

কে?

চন্দন দাঁড়িয়ে আছে। উবু হয়ে শাড়ি তুলে নিয়ে জড়িয়ে দিচ্ছে রহিমার শরীরে। সাইফুদ্দিন হুংকার ছাড়ে– এত বড়ো সাহস! সরকারি কামে বাধা দান! জানো তোমার পরিণতি কী হবি!

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তার দিকে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে তাকায় চন্দন। কোনো কথা বলে না। একটু দূরে মাটিতে গড়ানো মকবুলের লুঙ্গিটা তুলে এনে এগিয়ে দেয় তার দিকে। তারপর দারোগাকে বলে খুব শান্ত কণ্ঠে– নিজের হাতে ক্ষমতা তুলে নেওয়ার ফলাফল আপনি নিজেই পাবেন দারোগা সাহেব। আমি আইনের ছাত্র। আপনাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি এই লোকগুলোর সাক্ষী আর মকবুল ও তার স্ত্রী-র অভিযোগ পেলে কোর্টে আপনার চাকরি তো যাবেই, সেই সঙ্গে বছর দশেকের জেল নিশ্চিত।

নির্ভার হয়ে সেই উঠন্ত দুপুরে শত শত মানুষের সামনে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে মনা মাস্টার।

১৫

নিজের মুখোমুখি হওয়ার অবসর পাওয়ামাত্র প্রচণ্ড গ্লানি এবং আত্মধিক্কার আক্রমণ করে মনা মাস্টারকে। আশ্চর্য, সে নিজে যে এতখানি কাপুরুষ, তার নিজের কাছেই অস্পষ্ট ছিল তা এতদিন। অনেক সময় ধরে সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল সাইফুদ্দিন দারোগার হাতে মকবুল-রহিমার লাঞ্ছনা। কিন্তু প্রতিবাদী একটি শব্দও উচ্চারিত হয়নি তার মুখ থেকে। এটা কীভাবে সম্ভব হলো! তার কাছ থেকে এমন কাপুরুষোচিত নিষ্ক্রিয়তা অন্য কেউ তো বটেই, সে নিজেও কল্পনা করতে পারে না। অথচ সেটাই ঘটল।

ফিরোজা যদি ঘটনাটা শোনে তাহলে তার কাছেও কত ছোটো হয়ে যাবে মনা মাস্টার! বিবাহিত জীবনের কোনো সাধ পূর্ণ না হলেও স্বামীকে নিয়ে প্রচ্ছন্ন একটা গর্ব আছে ফিরোজার। তা হলো তার স্বামীর সততা, নিজের ক্ষতি স্বীকার করার সৎসাহস, আর অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর সাহস। এই ঘটনার কথা জানলে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে স্বামীর প্রতি তার শ্রদ্ধার মনোভাব! আর অন্য যারা পার্টিকর্মী। যারা এখনও পার্টি ছেড়ে যায়নি, তাদেরই বা কী ধারণা জন্মাবে মনা মাস্টারের সম্বন্ধে! মনা মাস্টারকে নেতা মেনে যারা এখনও অপেক্ষা করে আছে এই ভেবে যে এই সংকটকাল উত্তরণের একটা পথ মনা মাস্টার ঠিকই খুঁজে বের করবে। মনা মাস্টারের প্রতি তাদের নির্ভরতা তখন তলানিতে গিয়ে ঠেকবে না!

আর তাছাড়া সবার কথা যদি বাদও দেওয়া যায়, নিজের কাছে নিজে এখন কী জবাব দেবে মনা মাস্টার!

নিজের কাপুরুষতাকে শনাক্ত করতে পেরে তার এখন মাটির সাথে মিশে যেতে ইচ্ছা করছে।

ক্লাসে মন বসার মতো পরিস্থিতি একেবারেই নেই। হেডমাস্টারকে শরীর খারাপের কথা বলে বেরিয়ে আসে স্কুল ছেড়ে। কিন্তু এখন যাবে কোথায়! আগে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তো প্রিয় জায়গা ছিল চায়ের দোকানগুলো। চায়ের নেশার চাইতে সেখানে গেলে জটলাবাঁধা লোকজনের সাথে কথাবার্তার যে সুযোগ পাওয়া যায়, সেটাই ছিল মূল আকর্ষণ। এখন বেশ কিছুদিন থেকে জটলা এড়িয়ে চলে মনা মাস্টার। অনাকাঙ্ক্ষিত প্রশ্নের, কিংবা যেসবের উত্তর জানা নেই এমন প্রশ্নের মুখোমুখি হতে চায় না। কিন্তু আজ সেসব মনে নেই তার। নিজেকে খুব ছোটো মনে হচ্ছে। উদ্‌ভ্রান্তের মতো কিছুক্ষণ হাঁটে সে। বাজারের এ মাথা থেকে সে মাথা। শেষে বেখেয়ালেই বোধহয়, ঢুকে পড়ে মকছেদের চায়ের দোকানে।

অনেকদিন পরে তাকে দোকানে ঢুকতে দেখে সাদর আহ্বান জানায় মকছেদ– মাস্টারের বেটা যে আমাগের দোকানের রাস্তা ভুইল্যাই গেছ!

দোকানে বসে থাকা কয়েকজন মানুষ মকছেদের কথায় সচকিত হয়ে তাকায়। তারা ভালো করে খেয়াল করে মনা মাস্টারকে। তারপরে সসম্ভ্রমে জায়গা করে দিতে থাকে তার বসার জন্য। মুহূর্তেই বুঝে ফেলে মনা মাস্টার, আজকের থানার প্রসঙ্গ নিয়েই কথা চালাচালি হচ্ছে এখানে। একবার পালিয়ে যাওয়ার কথা মনে হয় তার। কিন্তু ঢুকে যখন পড়েছে, কিছু না কিছু অপমান এখন হজম করতেই হবে ভেবে বসে পড়ে একধারে। আর তখনই টের পায়, পরিস্থিতি সে যা ভেবেছিল তেমন নয়, বরং ঠিক তার উলটো। কথা শুরু করে মকছেদই– হ্যাঁ মরদের পার্টি থাকলে আছে এই মাস্টারেরই লাল ঝান্ডা পার্টি। ভয়-ডর কী জিনিস তা জানে না এই দলের মানুষ। আজ তো দশ গাঁয়ের মানুষ দেখল। এই যে অপমানডা হলো মকবুলের বউ, এই অপমান তো গোটা মা-জাতির অপমান, কেউ দাঁড়াল রুখে? কত তো শুনি বড়ো বড়ো নেতা আছে। সরকারি দলের নেতা, বিরোধী দলের নেতা। তারা কেউ আসল সামনে? আসল কে? একরত্তি একটা ছাওয়াল। মনা মাস্টারের পার্টির ছাওয়াল। দারোগা-পুলিশের ভয়ে অন্য হাজার হাজার মানুষ দাঁড়ায় দাঁড়ায় তামাশা দেখতিছিল।

মকছেদের কথা শেষ হতে দোকানে বসে থাকা অন্যেরা আরও তমিজের সাথে চোখ দিয়ে অভিনন্দন জানায় মনা মাস্টারকে। এর ফলে অস্বস্তি কমার বদলে আরও বেড়ে যায় মনা মাস্টারের। সত্য বটে চন্দন তাদের পার্টির ছেলে, এবং আজ তার আচরণ সত্যিকারের কমিউনিস্ট আচরণ, কিন্তু মনা মাস্টার নিজে এটা কী করল! আজ চন্দন না থাকলে আত্মগ্লানিতে হয়তো আত্মহত্যাই করতে হতো তাকে। কিন্তু ধীরে ধীরে আলোচনার সাথে সাথে তার মনের মেঘ কেটে যেতে থাকে। অন্যদের সাথে সাথে সে-ও বিশ্বাস করতে থাকে যে চন্দনের সাহসিকতার অংশভাগ একই পার্টিকর্মী হিসেবে তারও রয়েছে। বরং এই বিশ্বাস আরও দৃঢ় হতে থাকে যে যখন অন্য সবাই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে থাকে তখন কমিউনিস্টরাই পারে পদক্ষেপ নিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মকছেদকেও যেন আজ কমিউনিস্ট পার্টিতে পেয়েছে। সে অন্যদের উৎসাহী আলোচনায় পানি ঢেলে দিতে চায় এই বলে যে– এখন তো সক্কলে লাল ঝান্ডার কথাত পঞ্চমুখ। তা ভোটের সময় সবাই আছিলে কোন জাগাত? কেউ তো কাস্তে-হাতুড়ি মার্কাত ভোট দ্যাওনি। তখন খালি খুঁজো লাও মার্কা নাহয় ধানের শীষ। অথচ কোনো বিপদের সময় কাছে পাও ঐসব নেতারে?

তা পাই না। কিন্তু কারে বাছি কও! যে যায় লঙ্কাত, সেই হয় রাবণ।

এই কথা কলে চলবি না। আমরা কি ভালো মানুষেক ভোট দিছি কোনোদিন?

তা ভালো দেখেই তো দেওয়ার চেষ্টা করি।

ভালো না ছাই। এই যে মনা মাস্টারের পার্টির লোকমান উকিল ভোটে দাঁড়াল, তাক আমরা কয়জনা ভোট দিছি? অথচ যে তাক ভোট দেয়নি, জিজ্ঞেস কর সে-ও বলবি হ্যাঁ মানষের মতোন মানুষ থাকলে আছে সেই লোকমান উকিল।

একজন মিনমিন করে বলে– তাঁইরা যে ধর্ম মানে না। মোল্লারা ফতোয়া দিছিল, অরেক ভোট দিলে ইমান-আমান নষ্ট হয়া যাবি।

মোল্লারা তো ভাড়া খাটে। যে টাকা দেয়, তার পক্ষে ফতোয়া ঝাড়ে। আহা কী সব ধর্মপুত্রগুলানেক ভোট দি আমরা! জনগণের টাকা মারে, মাতাল, জুয়াড়ি, লোকজনেক দেখায় দেখায় মসজিদে দুইডা টিপ মারলেই সে খাঁটি মুসলমান হয়া গেল না!

এতক্ষণ চুপচাপ অন্যদের কথা শুনছিল মনা মাস্টার। এবার নিজের মনে হলো দুই-একটা কথা বলা দরকার। বিশেষ করে মকছেদ খুবই চাইছে মনা মাস্টার কিছু বলুক। নিজে কথা বলার সময় বারবার মনা মাস্টারের চোখের দিকে তাকাচ্ছিল তার সায় পাওয়ার জন্য। মনা মাস্টার একটু ভেবে ধীরে ধীরে বলে– ধর্ম সম্পর্কে কয়েকটা কথা বলা দরকার। আমাদের সম্পর্কে যে কয়টা অপপ্রচার আছে, তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি হয় ধর্ম নিয়ে। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞেস করি। দয়া করে সত্যি উত্তর দিবেন। আমরা কি কোনোদিন ধর্মের বিপক্ষে কোনো কথা বলেছি? কেউ শুনেছেন?

না, তা শুনিনি।

তাহলে কান কথাত মানুষ সম্পর্কে ধারণা কর ক্যা? মকছেদ বলে ওঠে।

মনা মাস্টার আলতো হাত তোলে মকছেদের দিকে। তাকে ইঙ্গিতে থামতে বলো। নিজেই বলতে থাকে– আমরা বলি যে আমরা একটা ধর্মনিরপেক্ষ দেশ চাই। ধর্মনিরপেক্ষ মানে ধর্মহীন না। এর মানে হচ্ছে যার যার ধর্ম সে সে নিজের মতো করে পালন করবে, রাষ্ট্র তাকে কোনো বাধা দিতে পারবে না। আর একটা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কথা হচ্ছে, রাষ্ট্র কোনো ধর্মকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া মানে অন্য ধর্মকে খাটো করা। ধরেন আপনারা পাঁচজন একটা কুটুমবাড়িতে গেছেন। তাদের মধ্যে শুধু একজনকে চেয়ার দেওয়া হলো। বাকিদের কথা কেউ ভাবলই না। তখন কি বাকিদের ছোটো করা হলো না?

তা হলো তো বটেই।

তাহলে আমাদের দেশে যখন রাষ্ট্রীয় ধর্ম ঘোষণা করা হলো ইসলামকে, তখন কি অন্য ধর্মের মানুষকে খাটো করা হলো না?

এই প্রশ্নের সোজাসুজি উত্তর দেওয়া মানুষগুলোর পক্ষে একটু কঠিনই। তারা উত্তর না দিয়ে গাঁইগুঁই করে। মনা মাস্টার বুঝতে পারে তাদের অস্বস্তি। তাই এড়িয়ে যায়। কথা বলতে থাকে নিজের মতো করে– তাছাড়া একটা কথা তো পরিষ্কার, আমাদের দেশে ধর্ম নিয়ে তো কোনো সমস্যা নেই। কেউ মসজিদে যেতে পারছে না, বা নামাজ-রোজা করতে বাধা পাচ্ছে, বা কাউকে ইসলামি লাইনে মাদ্রাসায় পড়তে বাধা দেওয়া হচ্ছে– এমন ঘটনা তো কখনো ঘটছে না। ঘটছে?

না।

তার মানে দাঁড়াচ্ছে ধর্মপালন বা ধর্ম আমাদের দেশে কোনো সমস্যা নয়।

ঠিক।

তাহলে আমাদের সমস্যা কী? সমস্যা হলো ভাত-কাপড়ের। সমস্যা হলো জমি-কাজ-বাসস্থান-শিক্ষা-চিকিৎসার। আমাদের দেশের শতকরা আশিভাগ মানুষ আমরা দুইবেলা খেতে পাই না। অন্যদিকে কিছু লোক সম্পদের পাহাড় গড়েছে। সম্পদের পাহাড় গড়েছে জনগণের চুরি করা টাকায়। আমরা বলি, আমাদের পার্টি বলে, আসল সমস্যা এইখানে। বিএনপি-আওয়ামী লীগ-জামাত এইসব দল হলো বড়োলোকের পার্টি। ওরা ক্ষমতায় গিয়ে বড়োলোকদের পক্ষেই সব আইন তৈরি করে। তাই বড়োলোক আরও ধনী হয়, গরিব আরও গরিব হয়। একথার সত্যতা খুঁজতে আপনাদের দূরে যেতে হবে না। নিজের নিজের জীবনের দিকে তাকালেই বুঝতে পারবেন।

তা কথা তো খুবই সত্যি বাপু!

মকছেদ ফোড়ন কাটতে ছাড়ে না– এত বোঝ, তা ভোটের সময় এই বুঝ যায় কোন জাগাত? তখন তো একশো টাকা, নাহয় একটা লুঙ্গি, নাহয় একটা শাড়ি পাইলেই তার বাক্সে যায়া সিল মারতে থাকো সমানে।

লজ্জিত ভঙ্গিতে হাসে মানুষগুলো। খুব নিচু গলায় বলে– অভাব রে বাপ, অভাবে পড়লে মানুষের হুঁশ-বুদ্ধি কিছু থাকে না। ইমান-আমানও থাকে না।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

১৬

তখনও ঘুম পুরোপুরি দূর হয়নি চোখ থেকে। বিছানা ছাড়ব ছাড়ব করছে মনা মাস্টার। হঠাৎ ঘরের মধ্যে নেমে এলো আকাশছোঁয়া সেই আয়না আর তার পেছনের মানুষটা।

মনে মনে আতঙ্কে কুঁকড়ে ওঠে মনা মাস্টার। নিজের মুখোমুখি করবে তাকে আয়নার মানুষটা। এর চাইতে বড়ো কষ্ট এখন মনা মাস্টারের কাছে দ্বিতীয়টি নেই।

আয়নার ওপারের মানুষটা একটু অভয়দানের ভঙ্গিতে হাসে। বলে– না। আজ তোমাকে গালিগালাজ করব না। এসো একটু ইতিহাস ঘাঁটাঘাঁটি করি। একটু তাত্ত্বিক আলোচনাও হোক।

এই অভয়-আশ্বাসেও অস্বস্তি কাটে না মনা মাস্টারের। সে চোখে উদ্বেগ নিয়েই তাকিয়ে থাকে আয়নার দিকে। আয়নার মানুষটা একটু স্বগতোক্তির মতো করেই বলে– গলদটা কি শুরুতেই ছিল?

কী?

মাঝে মাঝে মনে হয়, গলদটা বোধহয় শুরুতেই ছিল।

বুঝলাম না।

বলছিলাম রাশিয়ায় বিপ্লবের সময় থেকেই গলদটা থেকে গিয়েছিল। সমাজতন্ত্র নির্মাণের পূর্বশর্তগুলোর ঘাটতি ছিল লেনিনের রাশিয়ায়।

এবার মনা মাস্টার তর্কে ফুঁসে ওঠার চেষ্টা করে– তাই? অনেকেই তো তখন বলেছিল, রাশিয়ার মতো অনুন্নত দেশে বিপ্লব করাটা ভুল হয়েছে। তাদের উত্তর দিয়েছিলেন লেনিন– 'আমি জানি কিছু ঋষি আছেন যাঁরা নিজেদের খুব বুদ্ধিমান ভাবেন, এমনকি নিজেদের সমাজতন্ত্রীও বলেন, যাঁরা বলে থাকেন, সব দেশে একসঙ্গে বিপ্লব ফেটে পড়ার আগে আমাদের দেশে ক্ষমতা দখল করা উচিত হয়নি। জগৎ জুড়ে বিপ্লব শুরু না হলে অপেক্ষা করাই সমীচীন, একথা বলার অর্থ হলো– সবাই জুবুথুবু হয়ে অনন্তকাল অপেক্ষাই করতে থাকো।'

কথাটা তো ঠিকই। রাশিয়া কবে উন্নত পুঁজিবাদী দেশ হবে, তারপর বিপ্লব করতে হবে, এমনটা ভাবাই তো ঠিক না। কিন্তু সমস্যা তো ঠিকই হাজির হয়েছিল। বিপ্লবের পরে নেতারা প্রায় সবাই হতাশ হয়ে ভাবছিলেন– এই দেশের প্রযুক্তি এত পেছনে পড়ে আছে! এই প্রযুক্তি নিয়ে আমরা সমাজতন্ত্র গড়ব কীভাবে!

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ভাবো তো ট্রটস্কির কথা। তোমাদের তো আবার ট্রটস্কির কথা শুনলে অ্যালার্জি হয়। কিন্তু রুশ বিপ্লবে তাঁর অবদানের কথা অস্বীকার করলে তো চলবে না। সেই ট্রটস্কি বলেছিলেন যে প্রাচুর্যই হচ্ছে সমাজতন্ত্রের প্রাথমিক শর্ত। বলেছিলেন– 'সাম্যবাদের বস্তুভিত্তি হচ্ছে এমন একটা অবস্থা যখন মানুষের অর্থনৈতিক শক্তি এতটা উচ্চস্তরে পৌঁছে যাবে যে শ্রম তার কাছে বোঝা নয়, কাজে যেতে তার কোনো অংকুশের প্রয়োজন হয় না। জীবনধারণের যাবতীয় সামগ্রী এত প্রচুর যে আজ যেমন ধনী পরিবারে বা ভালো হোটেলে ও-ব্যাপারে কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না– শুধুমাত্র শিক্ষা, অভ্যাস ও সামাজিক মতামতের ওপরেই যা কিছু নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়– সমাজেও তাই হবে।

টাকার প্রতি অন্ধ অনুরাগ তখনই দূর হবে যখন সামাজিক সম্পদের ক্রমান্বয় বৃদ্ধির ফলে মানুষ নামক দ্বিপদ জীব প্রতি মিনিট বাড়তি শ্রম দিতে আর কার্পণ্য করবে না বা আজকে কতটা খাদ্য পাওয়া যাবে সেই অপমানকর চিন্তায় কাল কাটাবে না।'

রাশিয়াতে ঘটল উলটোটা। বিপ্লব যেখানে মানুষকে দেবে ভোগ্যপণ্যের প্রাচুর্য, সেখানে এলো কৃচ্ছতা। স্তালিন বারবার বলতেন– 'সমাজতন্ত্র গড়ে উঠতে পারে শুধুমাত্র উৎপাদনী শক্তিগুলোর সতেজ বিকাশের ওপর, শুধুমাত্র পণ্যের প্রাচুর্যের ওপর, শ্রমজীবী জনসাধারণের স্বাচ্ছন্দ্যের ওপর, তাদের সাংস্কৃতিক বিকাশের ওপর। সমাজতন্ত্র বলতে ব্যক্তিগত চাহিদার হ্রাস বোঝায় না, বোঝায় সেই চাহিদার ব্যাপকতম প্রসার, চাহিদার পূর্ণ প্রস্ফুটন; সেই চাহিদাকে সীমাবদ্ধ করা নয়, বা চাহিদা পূরণ করতে অস্বীকার করা নয়– সংস্কৃতি-সমৃদ্ধ শ্রমিক-জনতার সার্বিক সন্তোষ বিধানই হচ্ছে লক্ষ্য।'

কথাগুলো একেবারেই নতুন লাগছে মনা মাস্টারের কাছে। পার্টি যা নির্দিষ্ট করে দিত, তার বাইরের বই পড়া নিষিদ্ধ ছিল কর্মীদের জন্য। পার্টির পত্রিকা যা লিখবে, সেটাকেই ধ্রুবসত্য ধরে কাজ করে যেতে হবে। পার্টির স্টাডি সার্কেলে যা পড়ানো হবে, তার বাইরে কিছু ভাবা যাবে না। অথচ তা নিয়ে ভেতরে ভেতরে গর্বের শেষ ছিল না পার্টির লোকদের। নিজেদের সবাই ভাবত সত্যিকারের রাজনৈতিক পড়ুয়া মানুষ। অন্য দলগুলোর নেতা-কর্মীদের মূর্খ ছাড়া আর কিছু ভাবতে নারাজ ছিল তারা।

অথচ এখন দেখা যাচ্ছে নিজেদের পাঠগর্ব মাটিতে মিশে যাওয়ার অবস্থা। যে সোভিয়েত ইউনিয়নকে বিনা প্রশ্নে পৃথিবীর আদর্শ সমাজ বলে দাবি করে গেছে তারা যুগের পর যুগ, সেখানে এত বড়ো বড়ো গহ্বর!

ট্রটস্কিও বারবার বলতেন– সমাজতন্ত্র এখনও আসেনি সোভিয়েত দেশে। এসেছে এক উত্তরণের যুগ। পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের মধ্যবর্তী এক স্তর। অর্থাৎ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সোভিয়েত এগিয়ে যাবে সমাজতন্ত্রের দিকে, না আবার পিছিয়ে যাবে পুঁজিবাদে, সেই প্রশ্নেরই মীমাংসা হয়নি এখনও।

চরম ক্ষমতার অধিকারী স্তালিন হতাশা মিশিয়ে বারবার আউড়ে চলেছেন মার্কস-এঙ্গেলসের কথাগুলো– সমাজতন্ত্র শুরু হবে মানুষের জীবনধারণের সামগ্রীর চাহিদা মিটে যাওয়ার পর, পণ্যদ্রব্যের প্রাচুর্য সৃষ্টি হয়ে যাওয়ার পর। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে যদি গোড়াতেই মানুষের প্রাথমিক চাহিদাগুলো মেটানোর কাজে জড়িয়ে পড়তে হয়, তাহলে উন্নততর জীবনের ভিত্তিই বা তৈরি হবে কবে, এবং নতুন সাম্যবাদী মানুষই বা গড়ে উঠবে কবে? তত সময় কি দেবে দুনিয়ার সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো?

সেই কারণেই তাড়াহুড়া করতে হয়েছিল স্তালিনকে। তাড়াহুড়া করতে গিয়ে জোর খাটাতেও হয়েছিল। স্তালিন দ্রুত বড়ো এবং ভারী শিল্পকারখানা গড়ে তুলছিলেন। প্রত্যেক পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সোভিয়েত ইউনিয়ন পেছনে ফেলছিল ইউরোপ-আমেরিকাকে। তিরিশের দশকে সারা পৃথিবীতে যে ভয়াবহ অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিয়েছিল, তা থেকে পুরোপুরি মুক্ত ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন। শ্রমিকদের মজুরি বেড়েছিল ৭০০ শতাংশেরও বেশি।

কিন্তু ভোগ্যপণ্যের ঘাটতি রয়েই গেল।

এদিকে পার্টির মধ্যে যে আমলাতন্ত্র সৃষ্টি হয়েছিল, দিনে দিনে বেড়ে চলেছিল সেই আমলারা কিন্তু সুযোগ-সুবিধার দিক থেকে ইউরোপ-আমেরিকার মতো অবস্থাতেই রয়ে গেল। তাঁদের শহরে ফ্ল্যাট রয়েছে, গ্রামে আছে অবকাশ কেন্দ্র, তাদের এক-একজনের মাসিক আয় একজন খনিশ্রমিকের ত্রিশগুণ। তাঁরা নিজেদের মোটরগাড়ি ছাড়া চলাফেরা করেন না। এঁরা সরকারের শীর্ষ পদগুলো দখল করে রেখেছেন। এঁরাই বড়ো বড়ো যৌথখামারের প্রধান, ছোটো খামারগুলোর মালিক, এঁরাই সমবায় সমিতি আর ক্রেতাসমিতিগুলোর প্রধান। এঁরাই নিয়ন্ত্রণ করেন দেশের পণ্যের দাম। বড়ো শহরগুলোতে এঁরা তৈরি করিয়েছেন বিশেষ ধরনের দোকান। সেইসব দোকান পরিচিত 'বেরিওজ্‌কা' নামে। সেখানে তাঁরাই ডলারের বিনিময়ে কেনেন সকল ভোগ্যপণ্য, বিদেশি বিলাসসামগ্রী। সোভিয়েত নাগরিকরা যেখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে কেনেন রোজকার প্রয়োজনীয় জিনিস, এইসব দোকানে তাঁদের কেনাকাটার সুযোগ বা অধিকার নেই। কেননা সাধারণ নাগরিকের কাছে তো ডলার নেই। আর 'বেরিওজ্‌কা'তে ডলার ছাড়া অন্য কোনো মুদ্রা গ্রহণ করা হয় না।

পশ্চাৎপদ দেশ বলেই সাম্রাজ্যবাদের চাপটা হয়ে গেল অসহনীয়। এটা থেকেই সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের যাবতীয় বিকৃতি। অর্থনীতির ভারসাম্যহীনতা, ভারী শিল্পে প্রায় একতরফা ঝোঁক, ভোগ্যপণ্যের কখনো সত্যিকারের অভাব,

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কখনো কৃত্রিম অভাব, পণ্যের উৎকর্ষতা কমে যাওয়া, বিশাল সামরিক বাহিনী, তার চেয়ে বিশাল আমলাতন্ত্র।

এবার মরিয়া হয়েই মনা মাস্টার বলে– তার মানে কি সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের সফলতা নেই কোনো?

আয়নার ওপারের মানুষ একটু অবাক হয়ে বলে– সফলতা নেই এমন কথা কে বলছে? পৃথিবীকে পালটে দিয়েছে রুশ বিপ্লব। হিটলারের হাত থেকে পৃথিবীকে বাঁচাল কে? সোভিয়েত যোদ্ধারাই তো। স্তালিনের নেতৃত্বে। আজ যে আমাদের বাংলাদেশটা স্বাধীন হয়েছে, সেই স্বাধীনতার পেছনেও তো সোভিয়েতের বিরাট বড়ো অবদান।

অনেক সাফল্য আছে বলেই তো সোভিয়েতের পতনে আজ এত কথা হচ্ছে। নইলে কে ভাবতে যেত একটা রাষ্ট্রে কী পরিবর্তন হলো তা নিয়ে।

১৭

আয়না সরে যাওয়ার পরেও সেই ঘোর থেকে নিজেকে বের করতে পারে না মনা মাস্টার। তাদের পার্টি সবসময় স্তালিনকে সমালোচনাই করে এসেছে। তাকে রক্তপিপাসু বলেছে, অনেক হত্যার হোতা বলেছে। কিন্তু একটা মানুষ যদি এমন একনায়কই হবে, তাহলে বছরের পর বছর তার কথায় দেশটা চলে কেমন করে? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় রাশিয়ার মানুষ যুদ্ধ করেছে– 'দেশের নামে এবং স্তালিনের নামে'। তার মানে দেশ আর স্তালিন ছিল তাদের প্রেরণার উৎস। সেই স্তালিনের অবদানকে অস্বীকার করে কীভাবে তাদের পার্টি? স্তালিন সম্পর্কে কখনোই কোনো প্রবন্ধ-নিবন্ধ সে ছাপা হতে দেখেনি পার্টির পত্রিকায়। কোনো আলোচনায় হঠাৎ নামটি চলে এলেও এসেছে খুব নেতিবাচকভাবে। তাদেরকে বারবার যে কথাটি বলা হয়েছে, তা হচ্ছে লেনিন চাননি যে তাঁর পরে স্তালিন সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির জেনারেল সেক্রেটারি হোন। ১৯২৩ সালে পার্টির দ্বাদশ কংগ্রেস চলাকালীন সময় লেনিন ছিলেন মৃত্যুশয্যায়। তাই সশরীরে যোগ দিতে পারেননি কংগ্রেসে। তবে একটা চিঠি পাঠিয়েছিলেন প্রতিনিধিদের কাছে, তাঁরা যেন স্তালিনকে পার্টির জেনারেল সেক্রেটারি হিসেবে নির্বাচিত না করেন।

এই তথ্যটি সঠিক। চিঠিটাও পরে খুঁজে পাওয়া গেছে। কিন্তু লেনিন তো স্তালিনের বিকল্প হিসেবে অন্য কারও নামও প্রস্তাব করেননি সেই চিঠিতে। ১৯২২ সালের ২৪শে ডিসেম্বর তারিখে লেখা প্রথম চিঠিতে। তিনি সাধারণ সম্পাদক পদ থেকে স্তালিনকে সরানোর পরামর্শ দিয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন–

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"পার্টির সেক্রেটারি হিসেবে কমরেড স্তালিনের হস্তগত হয়েছে অসীম ক্ষমতা। তিনি যে সবসময় সুবিবেচনার সাথে এই ক্ষমতা ব্যবহার করবেন, সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই। অন্যদিকে কমরেড ট্রটস্কি পিপলস কমিসারিয়েট অফ কমিউনিকেশনস নিয়ে কেন্দ্রীয় কমিটির সাথে বিতর্কে জড়িয়ে আছেন। তিনি অবশ্য ইতোমধ্যেই তাঁর যোগ্যতার অনেক প্রমাণ দিতে পেরেছেন। তাঁর যোগ্যতা নিঃসন্দেহে অনেক বেশি। বর্তমান কেন্দ্রীয় কমিটির মধ্যে তিনিই যোগ্যতম ব্যক্তি। তবে নিজেকে তিনি অন্য সবার চাইতে উঁচু বলে ভাবতে পছন্দ করেন এবং এই মনোভাব তিনি বিভিন্ন সময় প্রদর্শন করেছেন। আর সেইসাথে নিজেকে কেবলমাত্র প্রশাসনিক কাজের মধ্যেই নিমগ্ন রেখেছেন সবসময়।

আমি কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যদের সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত মূল্যায়ন সংযোজন করতে চাই না। জিনোভিয়েভ এবং কামেনেভ সম্পর্কে আমি কেবল অক্টোবর বিপ্লবের সময়কালীন কথাগুলো মনে করিয়ে দিতে চাই। তবে তাঁদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ ব্যক্তিগতগতভাবে ট্রটস্কির অ-বলশেভিকসুলভ মনোভঙ্গির চাইতে বেশি নয়।

কেন্দ্রীয় কমিটির তরুণতর সদস্যদের মধ্যে আমি বুখারিন এবং পেতাকভ সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলতে চাই। আমার বিবেচনায়, তরুণদের মধ্যে এই দুজনই সবচাইতে উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। তাঁদের কথা মনে রাখার জন্য আমি আপনাদের অনুরোধ করি। বুখারিন হচ্ছেন আমাদের পার্টির মধ্যে সবচাইতে বড়ো তাত্ত্বিক, এবং সবচাইতে জনপ্রিয়ও বটে। তবে তাঁর তত্ত্ব অনেকাংশে মার্কসবাদের সাথে সাংঘর্ষিক হয়ে দাঁড়ায়। [আমার ধারণা, তিনি দ্বান্দিকতা (ডায়ালেকটিকস) ভালোভাবে পাঠ করেননি এবং সেটা বোঝেন বলেও মনে হয় না।]"

এই চিঠির সংযুক্তি হিসেবে লেনিন আরেকটি নোট লেখেন ১৯২৩ সালের ৪ঠা জানুয়ারি। সেখানে বলা হয়েছে– "স্তালিন খুবই রূঢ়। আমাদের নিজেদের মধ্যে এমনটি চলতে পারে। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির সেক্রেটারির ক্ষেত্রে এটি আদৌ গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। সেই কারণে আমি কমরেডদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি স্তালিনকে এই পদ থেকে অপসারণ করতে এবং নতুন এমন একজন সেক্রেটারি জেনারেল খুঁজে বের করতে যিনি স্তালিনের অন্য গুণাবলি ধারণ করবেন। তবে একই সাথে হবেন অনেক বেশি সহনশীল, বিশ্বস্ত, অনেক বেশি নম্র, অন্য কমরেডদের প্রতি সহানুভূতিশীল। সেইসাথে তাঁকে পুরোপুরি হতে হবে খামখেয়ালিপনা ও অসহিষ্ণুতা থেকে মুক্ত।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

স্তালিনকে বাদ দিতে বলছেন, তবে অন্য কারও পক্ষেও লেনিন কোনো সুপারিশ করছেন না। আসলে করার মতো অবস্থাতে লেনিন ছিলেনও না। কাকে মনোনয়ন দেবেন লেনিন?

ট্রটস্কি বলশেভিক পার্টিতে যোগ দিয়েছেন বিপ্লবের মাত্র কয়েকমাস আগে। রাজনৈতিক প্রশ্নে তিনি চিরকালই দোদুল্যমানতায় ভুগতেন। প্রবাসে থাকার সময়েও লেনিনের সাথে তাঁর মতের অমিল হয়েছে অনেকবার। লেনিনকে ছেড়ে তিনি মেনশেভিকদের সঙ্গে ভিড়েছেন বেশ কয়েকবার। লেনিন তবু ট্রটস্কির পাণ্ডিত্যকে খুবই উচ্চ মূল্য দিতেন। কিন্তু তার অতিরিক্ত উন্নাসিকতা সহ্য করা মুশকিলই ছিল। এমনও দেখা গেছে, কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ট্রটস্কির সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করা হলে তিনি সেই সভা থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিতেন। সবাই যখন সেই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছেন, ট্রটস্কি তখন পকেট থেকে কোনো উপন্যাস বের করে পাতা ওলটাতে শুরু করেছেন। যেহেতু তাঁর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়নি, অতএব মিটিং তাঁর কাছে আর কোনো গুরুত্ব বহন করে না।

জিনোভিয়েভ এবং কামেনেভ তো বিপ্লবের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতাই করেছিলেন বলা যায়। ১৯১৭ সালের ২৩ ও ২৯শে অক্টোবর বলশেভিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে লেনিন সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রস্তাব ও পরিকল্পনা করলে জিনোভিয়েভ এবং কামেনেভ তার বিরোধিতা করেছিলেন। শুধু তাই-ই নয়, তাঁরা দুজন এই খবরটি ফাঁস করে দিয়েছিলেন 'নোভয়া জিজন' নামের মেনশেভিক পত্রিকায়। এই বিশ্বাসঘাতকতার জন্য অক্টোবর বিপ্লব মারাত্মক ঝুঁকির মুখে পড়েছিল। লেনিন অবশ্য পরবর্তীতে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন এই দুজনকে। আবার বুখারিনকে 'বিপ্লবের গোল্ডেন বয়' বলে অভিহিত করলেও তিনি বিপ্লবকে নবীন সমাজতন্ত্রকে কতদূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন, তা নিয়ে লেনিনের দ্বিধা ছিল অনেক। তদুপরি, লেনিন জানতেন যে বুখারিন ডায়ালেকটিক্স বোঝেন না এবং তাঁর মধ্যে কিছুটা ডানপন্থি ঝোঁক রয়েছে। এমনকি ১৯১৮ সালে এক বৈঠকে তিনি লেনিনকে বন্দি করার প্রস্তাবও উত্থাপন করেছিলেন। তাঁর এই দার্শনিক ঘাটতি বিপ্লবের হাল ধরার ক্ষেত্রে তাঁকে অযোগ্য বলেই ঘোষণা করেছিল।

দ্বাদশ কংগ্রেসে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়েই স্তালিন সাধারণ সম্পাদক হিসেবে পুনর্নির্বাচিত হয়েছিলেন। যদিও অভিযোগকারীরা বলেছেন যে স্তালিন নাকি লেনিনের চিঠিটা লুকিয়ে রেখেছিলেন। কংগ্রেসের কোনো সদস্যকেই সেটি পড়তে দেননি। হয়তো কথাটা ঠিক। তবে একথাও ঠিক যে পরবর্তী কংগ্রেসে স্তালিন নিজেই সেই চিঠিটার কপি সকল প্রতিনিধির সামনে উপস্থাপন করেছিলেন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ত্রয়োদশ কংগ্রেসে লেনিনের চিঠি পাঠ করলেন কামেনেভ। চিঠি পড়া শেষ হতেই স্তালিন পার্টির সেক্রেটারির দায়িত্ব থেকে পদত্যাগের ঘোষণা দিলেন। তখন জিনোভিয়েভ বললেন যে, কমরেড লেনিন যে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন এই চিঠিতে, তা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। স্তালিন নিজের আচরণ সংশোধন করে নিয়েছেন। তিনি অতিরিক্ত রূঢ়তা দেখাননি, অবিনয়ী আচরণ করেননি। অতএব সংশোধিত স্তালিনই পার্টির সাধারণ সম্পাদক হিসেবে এখন সবচাইতে বেশি যোগ্য। তাঁকেই এই পদে বহাল রাখার জন্য আমি প্রস্তাব করছি। এই প্রস্তাব সর্বসম্মতিতে পাশ করা হয়। এমনকি ট্রটস্কিও এই প্রস্তাবের পক্ষেই ভোট দিয়েছিলেন। আসলে স্তালিনকে বলশেভিক পার্টির উপদলীয় কোন্দল এবং ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করতে হয়েছে বরাবর। এই ১৯২৩ সালের সেপ্টেম্বরেই স্তালিনের বিরুদ্ধে একটি গোপন বৈঠক করেছিলেন পার্টির কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় নেতা। তাদের মধ্যে ছিলেন জিনোভিয়েভ, বুখারিন, লাশেভিচ এবং এওদকিওভ। তাঁরা ডেকে এনেছিলেন আবার ভরোশিলভ এবং অর্জনিকিদ্‌জেকে। এদের মধ্যে লাশেভিচ তখন ছিলেন লালফৌজের জেনারেল, আর ভরোশিলভ ছিলেন সামরিক পরিষদের সহকারী প্রধান। খুব মারাত্মক ষড়যন্ত্র চলছিল। কিন্তু গোপন সূত্রে খবর পেয়ে হঠাৎ করেই সেই সভায় হাজির হলেন খোদ স্তালিন। জানতে চাইলেন এই গোপন সভার উদ্দেশ্য কী? খুব স্বাভাবিকভাবেই সন্তোষজনক উত্তর কেউ দিতে পারেননি। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, স্তালিন কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, যতখানি নিষ্ঠুর এবং রক্তপিপাসু বলে প্রচার করা হয়, স্তালিন সম্ভবত অতখানি ছিলেন না।

তবে সোভিয়েত সমাজতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য, এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যতটুকু দরকার, ততখানি নিষ্ঠুর তাঁকে হতেই হয়েছে। একটি অনুন্নত দেশের সব মানুষকে খাদ্য-বস্ত্র-শিক্ষা-চিকিৎসা-বাসস্থানের নিশ্চয়তা বিধান করেছেন তিনি। স্তালিনের জমানায় পাশ্চাত্যের মতো অত উন্নত কেন হতে পারেনি, সেকথা ভাবেনি তখন দেশের মানুষ। তারা কেবল এটাই হিসেব করেছে যে পুরাতন আমলের চেয়ে আমরা এখন কত বেশি ভালো আছি। সারা পৃথিবীর সাম্রাজ্যবাদীরা সোভিয়েতকে ধ্বংস করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল। তাদের বিরুদ্ধে প্রায় অজেয় একটি সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনি। পৃথিবীর দেশে দেশে মুক্তিকামী মানুষ যে লড়াই চালাচ্ছিল, তাদের পাশেও দাঁড়িয়েছিলেন।

দিন যত গড়িয়েছে, পার্টিতে নতুন সদস্য বেড়েছে আনুপাতিক হারে। কিন্তু বিপ্লবের পরীক্ষিত যোদ্ধাদের একটা বিরাট অংশ নিহত হয়েছেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কেউ কেউ নিহত হয়েছেন গুপ্তঘাতকের হাতে। তাদের অভাব পূরণ করা সম্ভব হচ্ছিল না কিছুতেই। এদিকে আমলাতন্ত্র জেঁকে বসেছে পার্টির মধ্যে। স্তালিন কমরেডদের সতর্ক করছেন এদের সম্পর্কে। বলছেন– 'সবচাইতে বিপজ্জনক হচ্ছে কমিউনিস্ট আমলারা। কারণ এরা তাদের আমলাতান্ত্রিক চেহারা ঢেকে রেখেছে পার্টির সদস্য পদের আড়ালে। এরকম কমিউনিস্ট আমলা আমাদের অনেক রয়েছে।' এবং এই আমলারা একের পর এক অন্তর্ঘাত চালিয়েছে। সেগুলো স্তালিনকে দমন করতে হয়েছে কঠোর হস্তে।

যে যুব সংগঠনের ওপর সবচেয়ে বেশি ভরসা, যেখান থেকে উঠে আসবে আগামী দিনের সোভিয়েত সমাজের কর্ণধাররা, সেই যুব কমিউনিস্ট লীগ নিয়ে দীর্ঘশ্বাসের সাথে স্তালিনকে বলতে হয়েছে– 'যুব কমিউনিস্ট লীগের এখানে-ওখানে এমন সব আপাদমস্তক দুর্নীতিগ্রস্ত নেতা বেরোচ্ছে যাদের বিরুদ্ধে নির্দয় সংগ্রাম চালানো ছাড়া পথ নেই।'

স্তালিনের জায়গাতে অন্য কেউ থাকলে তাকেও বোধহয় একই ভূমিকা পালন করতে হতো।

১৮

খুব সকালে এসে হাজির আফাজ।

সর্বনাশ হয়েছে। হরিশপুরের বিলের খাসজমির দখলিস্বত্ব থেকে উচ্ছেদের নোটিশ এসেছে ভূমিহীনদের নামে। বলা হয়েছে যে ঐ বিলের জমি নাকি খাস নয়। তার মালিক রয়েছে।

এমন কথা এই প্রথম শুনল মনা মাস্টার। সম্ভবত এলাকার মানুষও এই প্রথম শুনল। কে এই নতুন গজিয়ে ওঠা মালিক? সরকারি দলের নেতা, জেলা কমিটির দোর্দণ্ডপ্রতাপ সাংগঠনিক সম্পাদক রিফুজি শাহ আলম।

এ কীভাবে সম্ভব!

তহশিলদার জানায় সম্ভব। কারণ আদিতে এই বিলের মালিকানা ছিল রানি ভবানীর পরিবারের জমিদারদের। ১৯৪৭-এর পরে তার পরিবারের অধঃস্তন পুরুষের কাছ থেকে এই জমি কিনে নিয়েছিল শাহ আলমের পূর্বপুরুষ।

তাহলে এতদিন কেউ জানল না কেন? শাহ আলমই বা এতদিন দাবি করল না কেন?

করেনি। এতদিন দরকার হয়নি তাই করেনি। এখন সে নিজের জমি নিজের এক্তিয়ারে বুঝে নিতে চায়।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

একই কথা বলে এসি ল্যান্ড, টিএনও, এডিসি রেভিনিউ। এডিসি রেভিনিউ একসময় পার্টির ছাত্র সংগঠনের সাথে ছিল। সে আড়ালে ডেকে নিয়ে মনা মাস্টারকে জানায় যে শাহ আলমের দলিল যে ভুয়া একথা সে নিজেও জানে। নিজে ভূমির অফিসার হিসেবে এতদিন ধরে দায়িত্ব পালন করার পরেও বাংলাদেশের জমি আইনের জটিলতা এবং জমি নিয়ে দুর্নীতির কারণে সে নিজেও অসহায় বোধ করে। এক্ষেত্রে শাহ আলম কোনো দলিল লেখককে দিয়ে নকল দলিল তৈরি করিয়ে নিয়েছে, তারপর তহশিলদারকে দিয়ে কাগজের সাথে উলটাপালটা যা-ই হোক একটা রেকর্ড জুড়ে নিয়েছে। এসি ল্যান্ডকে দিয়ে নামজারি করিয়েছে।

কিন্তু নামজারি করতে গেলে নোটিশ দিতে হবে না? এখানে বসবাসকারীদের কেউ কোনো নোটিশ পায়নি।

এটা তো পানির মতো সহজ কাজ। এসি ল্যান্ড অফিস থেকে একটা নোটিশ ইস্যু করা হয়েছে বটে। কিন্তু সার্ভ করা হয়নি কোথাও। যদিও ডাকখরচের কাগজ দিয়ে দেখানো হয়েছে যে নোটিশ ডাকে দেওয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সেটা হয়তো পড়ে ছিল এসি ল্যান্ডের টেবিলের ড্রয়ারেই। মাসখানেক পরে কাগজে-কলমে দেখানো হয়েছে যে কারও কাছ থেকে কোনো আপত্তি আসেনি। পত্র মারফত বা সশরীরে কেউ কোনো আপত্তি দাখিল করেনি। যেহেতু আপত্তি আসেনি, অতএব খাজনা জমা দিয়ে জমির নামজারির অধিকার শাহ আলমের বর্তায়। ব্যস, হয়ে গেল।

ব্যস, হয়ে গেল। এত সহজ সবকিছু!

এডিসি রেভিনিউ ম্লান হাসে– হাতে ক্ষমতা থাকলে এখন সবকিছু এমনই সহজ মনোয়ার ভাই।

তাহলে আপনাদের আর কিছু করার নেই?

আমরা অসহায়।

ম্লান হাসে মনা মাস্টার– আপনার মতো এত উপরের সরকারি প্রশাসনিক অফিসারই যখন অসহায়, তখন নিঃস্ব ভূমিহীন খেতমজুরের কথা ভাবুন।

এডিসি রেভিনিউ বোধকরি একটু লজ্জা পায়। বলে– মাঝে মাঝে চাকরি ছেড়ে দিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু ছেড়ে দিয়ে কোথায় যাব! যেখানেই যাই না কেন, পরিস্থিতি তো একই। তবে একটা কথা বলি। পরিস্থিতি আপনাদের অনুকূলে ততদিন থাকবে, যতদিন দখল থাকবে ঐ ভূমিহীনদের হাতে।

তাহলে কী করা যায়?

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ভালো কোনো উকিল দিয়ে কেস ফাইল করান। জানেনই তো জমির এসব মামলা চলতে থাকে বছরের পর বছর ধরে। দখল ছাড়বেন না। মামলা চলতে থাকুক। বছর পাঁচেক চলুক। এর মধ্যে যদি অন্য সরকার আসে তাহলে হয়তো চিরস্থায়ী সুরাহা একটা করে নিতে পারবেন।

জেলা প্রশাসকের কাছে একটা দরখাস্ত করব কি?

করতে পারেন। তাৎক্ষণিক কোনো লাভ হবে না। সরকারি দলের এমপি সরাসরি জড়িত এই কাজের সাথে। ডিসির কোনো সাহস হবে না তার বিরুদ্ধে যাওয়ার। যদি কেউ কিছু করতে পারে তা সে এমপি নিজে। অন্য কেউ নয়।

যে এমপি নিজে এই অপকর্মের নির্দেশদাতা, তার কাছে প্রতিকারের জন্য গিয়ে আর কী হবে! তবু কেউ কেউ যাওয়ার পক্ষে। তাদের যুক্তি হচ্ছে খড়-কুটো যা-ই হোক আঁকড়ে ধরতে অসুবিধা কী! তাছাড়া এতগুলান মানুষের কথা অন্তত মুখের উপর ফেলে দেওয়ার সাহস এমপি-র হবে না। না গেলে তো না যাওয়াই হলো। অর্থাৎ তাকে পুরো দায়-দায়িত্ব থেকে মুক্ত করে দেওয়া হলো। সে যদি পরে বলে যে আমি কিছুই জানতাম না, আমাকে তোমরা কিছু জানালে না, তাহলে আমার কোনো দোষ থাকে কী করে? তখন আমরা তাকে ধরব কীভাবে? অর্থাৎ তার কাছে না গেলে তাকে পুরোপুরি দায়মুক্ত করে দেওয়া হয়। গেলে অন্তত তার প্রকৃত স্বরূপটা প্রকাশ করতে তো সে বাধ্য হবে।

আফাজের সার কথা– যদি এমপি-র কাছে যাওয়া হয়, তাহলে মিছিল নিয়ে যাওয়া হবে। দয়াভিক্ষা করতে নয়, যেতে হবে প্রতিবাদ করতে।

না না, মিছিল করার দরকার নেই। আগেই তাকে আমরা প্রতিপক্ষ বানাতে যাব কেন? দয়াভিক্ষার মতো করেও যাব না। যাব নিজেদের ন্যায্য অধিকারের কথা সম্মানের সঙ্গে মনে করিয়ে দিতে।

তবে এমপি-র কাছে যাওয়ার পক্ষেই মত দেয় মনা মাস্টার। নিজের কাছে তার যুক্তি হচ্ছে, এই ধরনের লোক নিজেদের ক্ষমতার প্রকাশ দেখাতে পছন্দ করে। তার কাছে এতগুলো লোক ধরনা দিলে তার ইগো যতখানি পরিতৃপ্ত হবে, সেই পরিতৃপ্তির লোভে হলেও সে এই লোকগুলোকে খালি হাতে ফেরত পাঠাতে পারবে না। তারা তো সব সময়ই চায় যে মানুষ তাদের কাছে আসুক। আফাজ এককথায় বলে– দোমুখা সাপ। সর্প হয়া দংশন করে ওঝা হয়া ঝাড়ে।

তো যাওয়াটা যখন সাব্যস্ত হলো, এবারের প্রশ্ন হচ্ছে কে কে যাবে।

সবাই যেতে চায়।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মনা মাস্টার বোঝায়– প্রথমেই সবার যাওয়ার দরকার নেই। প্রত্যেককে রোজকার ভাত রোজ খেটে উপার্জন করে খেতে হয়। সকলের কাজ কামাই করার দরকার কী? তার চেয়ে প্রথমবার মুরুব্বিগোছের কয়েকজন যাক, যারা কথাগুলো গুছিয়ে বলতে পারবে। দেখা যাক এমপি-র মনোভাব কী। তারপর না হয় অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেওয়া যাবে।

আচ্ছা তা-ই সই। রাজি হয় লোকেরা। কিন্তু শর্ত জুড়ে দেয়– মনা মাস্টারকে সঙ্গে যেতে হবে।

মনা মাস্টার আপত্তি করে– আমার না যাওয়াই ভালো। কারণ আমি একটা পার্টির লোক। এবং সেই পার্টি এমপি-র দলের ঘোর বিরোধী। আমি গেলেই সে মনে করবে যে এর পেছনে রাজনৈতিক ইন্ধন আছে। আমাদের পার্টি তাকে বেকায়দায় ফেলার জন্যই লোকজন নিয়ে ইস্যু তৈরি করছে। তখন সে পুরোপুরি বিরুদ্ধে চলে যেতে পারে।

এক বুড়ো বলে ওঠে– বাবা মনা। তোমার কথা সত্যি। কিন্তু এই কথাও তো সত্যি যে আজ আমরা যে এই বিলের মাটিত নিজেরে ঘর করে থাকতে পারতিছি, তা তো তোমাদের পার্টির দানেই। এই খাসজমি তোমরাই তো আমারেক দখল করে দিছিলে। আমরা বেইমান। ভোটের সময় তোমাগের কথা মনে রাখিনি। টেকা লিয়া নিজের শত্রুক ভোট দিছি। সেই অপরাধে আমারেক ত্যাগ কর না বাপ। আজ বিপদের সময় আবার তোমাগের কাছেই নির্লজ্জের মতো চলে আসিছি। এখন আমাগের কথা হচ্ছে, এমপি যা ভাবে ভাবুক, তোমাক ছাড়া আমরা এমপি-র কাছে যাব না।

বিব্রত বোধ করে মনা মাস্টার– দ্যাখেন, আসলে আমি ঐভাবে ভাবিই-নি। আমি এমপি-র কাছে যেতে চাইছি না আপনাদের স্বার্থের কথা ভেবেই।

আমরা আর ভাবাভাবির মধ্যে নাই। আর তোমার পাশ আমরা ছাড়ব না। এমপি যা খুশি ভাবুক, আমরা চাই তুমি আমাগের সাথে যাবে।

সায় আসে এমাথা-ওমাথা থেকে– হ্যাঁ মাস্টার, আপনে চলেন। আপনেক ছাড়া আমরা আর কারও ওপর ভরসা করতে পারতিছি না।

আপনারা বললে আমি অবশ্যই যাব। কিন্তু আমি এখনও বলছি, আমার না যাওয়াটাই আপনাদের জন্য ভালো হবে।

না। আমরা তোমাক ছাড়া যাব না।

ঠিক আছে। রাজি হয় মনা মাস্টার। বলে– তাহলে এখন ঠিক করেন বাকি কে কে যাবেন। আর কখন যাবেন। যখন-তখন গেলে তো আবার হবে না। এমপি-কে পেতে হবে। অন্তত আমাদের কথাগুলো যাতে শোনে, সেই রকম সময় বের করতে হবে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ঠিক করা হলো কে কে যাবে।

মনা মাস্টার বলল– কেউ একজন গিয়ে আকমলের সঙ্গে দেখা করতে পারবেন? শুনেছি তার সাথে এখন এমপি-র নাকি খুব খাতির।

কোন আকমল?

উত্তর দিতে গিয়ে লজ্জায় নিজের কানের লতি লাল হয়ে যায় মনা মাস্টারের– ঐ যে আকমল। আমার বন্ধু। আগে আমাদের পার্টি করত। এখন সরকারি দল করে।

তা তোমার বন্ধুর সাথে তুমি নিজেই তো কথা বলতে পার!

আমতা আমতা করে মনা মাস্টার– মানে এখন আর আমার সাথে তেমন যোগাযোগ নাই তো। সে এখন কখন কোথায় থাকে আমি ঠিক জানি না। কেউ একজন যদি তার খোঁজ নিয়ে আসে, সে কোথায় আছে জানতে পারলে আমি গিয়ে কথা বলে আসতাম।

দরকার কী বাপু ওসব ভায়া-টায়া ধরার। তার চায়ে চলো আজ সাঁঝের পরে পাঁচজন একসাথে যাই এমপি-র বাড়িত। যদি তাক পাওয়া গেল, ভালো। না পাওয়া গেলে কখন পাওয়া যাবি শুনে আসি। সেই সময় অনুযায়ী যাওয়া যাবি।

সন্ধ্যার পরে এমপি-র বাড়ির সামনে গিয়ে বাকি চারজনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মনা মাস্টার। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিড়ি ফুঁকছে চার মুরুব্বি। তাদের আচরণের মধ্যে অস্বস্তির ছাপ। অস্বস্তি মনা মাস্টারের মনেও। নেতার বাড়ির সামনে লোকের যত ভিড় দেখা যাচ্ছে, তাতে তার কাছে পৌঁছানো মুশকিল। তাছাড়া গিয়ে যদি দেখা যায়, রিফুজি শাহ আলম বসে আছে তার পাশে, তাহলে কীভাবে কথাটা তুলবে তারা!

কাঁধ ঝাঁকিয়ে অস্বস্তি ঝেড়ে ফেলল মনা মাস্টার– আগে ঢুকে পড়া যাক। তারপর যা হয় হবে!

খুব কষ্টে-সৃষ্টে লোকের ভিড়ের ফাঁক দিয়ে এক পা দুই পা করে এগোচ্ছিল মনা মাস্টার। বিশাল বড়ো বৈঠকখানা ঘর। সেই ঘরেও আঁটছে না লোক। চেয়ার পাতা সারে সারে। সেগুলোতে সবার জায়গা হয়নি। দাঁড়িয়ে আছে অনেক লোক। তাদের মধ্যে অনেকে এমনও আছে যাদেরকে এলাকায় গণ্যমান্য লোক মনে করা হয়। পরিস্থিতি দেখে দমে যাচ্ছিল মনা মাস্টার। এমন পরিস্থিতে তাদের কেমন অভ্যর্থনা জানানো হবে তা তো বোঝাই যাচ্ছে। কিন্তু এমপি-র প্রতিক্রিয়া পুরোপুরি হতবাক করে দিল তাকে। তার দিকে হঠাৎ চোখ পড়ল এমপি-র। সঙ্গে সঙ্গে সটান উঠে দাঁড়াল এমপি– আরে মনোয়ার ভাই আপনি! আসেন আসেন! এই জায়গা দাও। মনোয়ার ভাইকে বসতে দাও।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তার সামনের টেবিলে গায়ে গা লাগিয়ে বসে থাকা লোকগুলোকে হড়বড় করে উঠিয়ে দিল এমপি– বসেন ভাই। বসেন।

কাউকে চেয়ার থেকে উঠিয়ে দিয়ে নিজে বসার কথা ভাবতে অস্বস্তি হয় মনা মাস্টারের। ইতস্তত করে বলে– না, না, আমার না বসলেও চলে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারলেও হবে। আমার জন্য কাউকে উঠিয়ে দেওয়ার দরকার নেই।

আরে এরা সারাদিন আমার সামনে বসেই থাকে। এরা কিছুক্ষণ দাঁড়ালে ক্ষতি নেই। দাঁড়াক। নাহয় বাইরে গিয়ে কিছুক্ষণ ঘুরে আসুক। বসেন আপনি!

বসতে বসতে মনা মাস্টার বলে– খুব ঠেকায় পড়ে আপনার সময় নষ্ট করতে এলাম। কয়েকটা কথা বলা দরকার।

ইতোমধ্যে সে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে নিয়েছে রিফুজি শাহ আলম নেই এমপি-র ঘরে। একটু হলেও শ্বাস ফেলেছে স্বস্তির।

এমপি দরাজকণ্ঠে বলে– আরে কথা তো হবে। সেসব পরে হবে। আপনি এই প্রথম এলেন আমার বাড়িতে। কিছু চা-পানি খান। তারপরে কথাবার্তা হবে।

তার সার্বক্ষণিক চামচাকে চোখের ইশারা করে এমপি– যা উপরে গিয়ে বল মনোয়ার ভাইয়ের কথা। চা রেডি হলে তারপরে আমরা আসছি উপরে।

মনা মাস্টার নিরস্ত করতে চায় তাকে– চা আরেকদিন এসে খাব। তাছাড়া আমি একা নই। আমার সাথে আরও চার মুরুব্বি আছে। হরিশপুর বিলের।

এমপি-র মুখে ছায়া ঘনায়। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই আবার স্বাভাবিক হয়ে যেতে পারে সে– তাতে কী হয়েছে! মুরুব্বিদের নিয়ে একসাথেই চা খাব আমরা।

চায়ে চুমুক দিতে দিতে মনোযোগ দিয়ে তাদের কথা শুনল এমপি। মাথা ঝাঁকালো আফসোসের সাথে– সব চাটার দল বুঝলেন মনোয়ার ভাই। ঐ যে শেখ সাহেব একবার বলেছিলেন না যে অন্য দেশে পাওয়া যায় সোনার খনি। আর আমি পেয়েছি চোরের খনি। ঐ একই কথা বলতে হয় এখন আমাকে। লোকজনের সামনে তো বলতে পারি না। আপনার কাছে মন খুলে বলতে পারছি। আপনাদের মতো তো ছাঁকা মানুষদের নিয়ে আমাদের দল না। আমাদের দলে চোরও ঢোকে, সাধুও ঢোকে। ভোটের ব্যাপার। মানে ভোটের রাজনীতি। কাউকে অসন্তুষ্ট করে কথা বলাও আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। বাধ্য হয়ে সব সহ্য করতে হয়। বিশ্বাস করেন, শাহ আলম যে এই কাজ করেছে আমি তার বিন্দুবিসর্গও জানি না। আশ্চর্য, মানুষের কত টাকার দরকার হয়! আপনি জানেন, ওকে আমি এক বছরে অন্তত কয়েক কোটি টাকার ঠিকাদারি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কাজ দিয়েছি! তার পরেও এই নিঃস্ব মানুষগুলোকে ভিটাছাড়া করার চিন্তা করাই তো অন্যায়। না। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি এ আমি হতে দেব না। তবে বোঝেনই তো, আমার পক্ষে ডাইরেক্ট কিছু করা মুশকিল। প্রথম কথা সে আমাদের দলের নেতা। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, ওদেরও তো ওপর মহলের কিছু নেতার সাথে চেনাজানা আছে। মানে এইসব দলের গ্রুপিং এর কাহিনি তো আপনি জানেনই। তবু আমি বলছি, এই ব্যাপারটার সুরাহা আমি করব। একটু টেকনিক্যালি করতে হবে। আমি উপায় ভেবে বের করব অবশ্যই।

মনা মাস্টার জানতে চায়— তাহলে আমরা আবার কবে আসব?

না না। আপনাকে আসতে হবে না। আপনি এমনিতে আমার সঙ্গে গল্প করতে চাইলে যেকোনো সময় আসতে পারেন আমি তাহলে খুবই খুশি হবো। কিন্তু এই ব্যাপারটার জন্য আপনি একবার এসেছেন, তা-ই যথেষ্ট। কীভাবে কাজটা করা যাবে না যাবে, তা আমিই আপনাকে জানাব।

কীভাবে জানাবেন? হেসে জানতে চায় মনা মাস্টার।

এমপি-ও হাসে— সেই দায়িত্ব আমার। যদি দরকার হয়, আমি নিজেই আপনার বাড়িতে গিয়ে জানিয়ে আসব।

তার মানে, মনা মাস্টার বুঝে ফেলে, তাদের কাজটা কোনোদিনই করবে না এমপি।

১৯

কিন্তু পরদিন বিকালে তাকে হতবাক করে দিয়ে তার বাড়ির সামনে এসে থামে এমপি-র পাজেরো গাড়ি। মেয়ের হাত ধরে কেবল বৈকালিক বেড়ানোর প্রস্তুতি নিচ্ছিল মনা মাস্টার। একটু হতচকিত হয়ে পড়ে এমপি-র হঠাৎ আগমনে। গাড়ি থেকে নেমে সোজা বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ে এমপি। ফিরোজাও সময় পায়নি কোনো প্রস্তুতির। তাকে সরাসরি বলে এমপি— বিনা দাওয়াতে চলে এসেছি ভাবি। তাই বলে মাফ নেই। আপনার হাতের চা না খেয়ে যাচ্ছি না।

ফিরোজা তাৎক্ষণিকভাবেই ফিরে পায় নিজেকে। খুব উচ্ছ্বসিত হয়েছে এমন ভাব ফোটে না আচরণে। বলে— চা আমি অবশ্যই খাওয়াব। কিন্তু আপনে বোধহয় দার্জিলিং চা ছাড়া খান না। আর আমার বাড়িত তিরিশ টাকা কেজির সস্তা গুঁড়া চা। খাবেন তো?

দিয়েই দেখেন খাই কি না! আর চা তো শুধু দামি হলেই ভালো হয় না। যে চা বানায়, তার আন্তরিকতার ওপর চায়ের ভালো হওয়া না হওয়া নির্ভর করে অনেকখানি। কী বলেন মনোয়ার ভাই!

মনা মাস্টার শুধু হাসে। সায় দেয় না। বিরোধিতাও করে না।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এমপি তার ড্রাইভারকে বলে– শোনো, তুমি বাড়িতে চলে যাও। আমাকে নিতে আসতে হবে না। আমি চলে আসব রিকশাতে। আর আমি যে এখানে আছি, তা কাউকে বলার দরকার নেই। আমি মনোয়ার ভাইয়ের সাথে মন খুলে একটু সুখ-দুঃখের গল্প করতে চাই। কোনো ডিস্টার্ব চাই না, বুঝলে!

বাবাকে চেয়ার টেনে বসতে দেখে সিমি জিজ্ঞেস করে– বাবা আজ আমরা বেড়াতে যাব না?

শশব্যস্ত হয়ে ওঠে এমপি– আহা মেয়েটার বেড়ানো নষ্ট করলাম আমি। মামণি, তুমি নাহয় এক কাজ কর। আমার গাড়িতে চড়ে বেড়িয়ে এসো। তুমি যেখানে যেতে চাও, ড্রাইভার তোমাকে নিয়ে যাবে।

ফিরোজা নিরস্ত করে মেয়েকে– ছিঃ মা, বাড়িত মেহমান আস্‌লে কেউ তাক ফেলে বেড়াতে যায় নাকি! চাচা আসিছেন তোমার বাবার সাথে কথা বলার জন্য। তাই আমাগের মেহমান। তুমি এক কাম কর। যাও মাঠে গিয়া তিষা আর তুতলিরে সাথে খেলো যায়ে।

সিমি এই প্রস্তাবে বেশ খুশির সাথেই রাজি হয়ে বেরিয়ে যায়।

বাড়ির ভেতরের দিকের বারান্দায় চেয়ার টেনে এমপিকে নিয়ে বসে মনা মাস্টার। ফিরোজা রান্নাঘরে ঢুকে নিজের ভাঁড়ার পরীক্ষা করে। তারপর বাইরে এসে জিজ্ঞেস করে– চায়ের সাথে একটু সুজির হালুয়া চলবি কি ভাই?

খুব চলবে।

তারপরে মনা মাস্টারের দিকে ফিরে কথা শুরু করে এমপি– আপনাদের পার্টিটা ভেঙে টুকরা টুকরা হয়ে গেল। ভেরি স্যাড! বাইরে আমরা যতই আপনাদের বিরুদ্ধে গলাবাজি করি না কেন, দেশে আপনাদের কমিউনিস্ট পার্টির মতো পার্টি থাকা খুবই দরকার। অন্তত আমি তা-ই মনে করি। দেশে যে কয়টা আদর্শ মানুষ তৈরি হয়, লেখক তৈরি হয়, বুদ্ধিজীবী তৈরি হয়, তা তো আপনাদের মতো পার্টিই তৈরি করে।

এসব কথার পিঠে কী বলা যায়, ভেবে পায় না মনা মাস্টার। তাছাড়া এমপি-র এসব কথা বলার পেছনের উদ্দেশ্যটা এখনও ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না সে।

এমপি বলে চলে– গতকালের ব্যাপারটা, মানে আমাদের সাংগঠনিক সম্পাদক শাহ আলমের অপকীর্তির ব্যাপারটা আমাকে খুবই ভাবিয়েছে। বলতে গেলে ঐ চিন্তায় সারা রাত আমি তেমন করে ঘুমাতেই পারিনি। আমাদের দেশের আমলাতন্ত্রের যে অবস্থা, দুর্নীতি করার সুযোগ সবারই খুব বেশি। হাতে একটু ক্ষমতা থাকলে তো কথাই নেই। রোজ এই রকম শাহ আলম ডজন ডজন তৈরি হতে থাকবে। আমি একা কয় দিক সামাল দেব বলেন!

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মনা মাস্টার এবারও কিছু বলতে পারে না এমপি-র কথার পিঠে। এমপি খেয়ালই করে না ব্যাপারটা। এসব লোক নিজের কথা বলতেই সাধারণত অভ্যস্ত। অন্যের কথা শুনতে নয়। এখন মনা মাস্টারের মতো ধৈর্যশীল শ্রোতা পেয়ে তার বলার উৎসাহ আরও বেড়ে চলে— বলছিলাম আমি একা আর কত দিকেই বা সামলাতে পারি! কিন্তু এইভাবে যদি একটার পর একটা অপকর্ম হতে থাকে, তাহলে আমি তো শেষ। কারণ পাবলিক দোষ তো দেবে আমাকেই। ঠিক কি না বলেন?

মাথা দুলিয়ে এবার সায় দেয় মনা মাস্টার— ঠিক।

তাহলেই বোঝেন আমার অবস্থা। দুধারী তরোয়ালের উপর বসে আছি আমি। যেতেও কাটে, আসতেও কাটে। পাশে যদি ভালো কিছু লোক পেতাম, তাহলে সত্যি সত্যি আমি এলাকার লোকের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য কিছু কাজ শুরু করতে পারতাম।

এবার একটু একটু আলো দেখতে পাচ্ছে মনা মাস্টার। এমপি কেন তার বাড়িতে এসেছে বোধহয় সেই উদ্দেশ্যটা বুঝতে পারছে। বিতৃষ্ণায় ছেয়ে যায় তার মন। এমপি-র বাকি কথাগুলো শোনার ইচ্ছাও হয় না আর। কিন্তু বসে থাকতে হয় চুপচাপ ধৈর্যশীল শ্রোতা হয়ে।

এমপি বলে চলেছে— আমি আপনার কাছে এসেছি সহযোগিতা চাইতে ভাই। এই যে হরিশপুরের বিল নিয়ে যে ঘটনা ঘটল, এমন ঘটনা একের পর এক ঘটতেই থাকবে।

তা আমি কী করতে পারি!

আপনি রাজি থাকলে অনেক কিছু করতে পারেন। এই এলাকার মানুষের হয়রানি বন্ধ করতে পারেন।

কীভাবে?

আমি এলাকায় জানিয়ে দেব এই ধরনের ব্যাপারগুলো ডিল করবেন আপনি। আপনার হাতে আমি পুরো ক্ষমতা তুলে দেব। ডিসি-এসপিসহ প্রশাসনের লোকজনকে জানিয়ে দেব এই সিদ্ধান্তের কথা। এই জাতীয় সব গোলমালের সালিশ-নিষ্পত্তি করবেন আপনি। ইচ্ছা হলে দুই পক্ষের কথা শুনবেন। যদি মনে করেন দরকার নেই, তাহলে বক্তব্য শোনা ছাড়াই আপনি যে সুপারিশ তৈরি করবেন, আমি নির্দ্বিধায় তা বাস্তবায়নের হুকুম দেব। বলেন আপনি করবেন কাজটা?

উত্তর দিতে গিয়ে একটু সময় নেয় মনা মাস্টার— আমাকে ভাবনা-চিন্তা করতে হবে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হাসে এমপি– আরে ভাবনা-চিন্তার কী দরকার! আপনাকে তো আর দল ত্যাগ করতে হচ্ছে না। আমি তো আপনাকে বলছি না যে আমার দলে যোগ দিন। আমি শুধু আপনার সততা, মেধা আর যোগ্যতাকে কাজে লাগাতে চাইছি।

একটু বিরতি নিয়ে এমপি বলে– দলের কথা যখন উঠেই পড়ল তখন বলি, নিজের ভবিষ্যতের কথা যদি বাদও দেন, কমিউনিস্ট পার্টি করে আপনি মানুষের কোনো উপকারেই লাগতে পারবেন না। মানুষের উপকার করতে হলে কম হোক, বেশি হোক ক্ষমতার দরকার হয়। বাম রাজনীতি করে ক্ষমতা পাওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই। আমি প্র্যাকটিক্যাল কথা বলছি। আমার বাবা চিরকাল ভাসানী ন্যাপ করেছে। আপনাদের মতোই নিজের সহায়-সম্পদ বিলিয়ে দিয়েছে পার্টির কাজে। জেল খেটেছে বারবার। কিন্তু ভোটে দাঁড়ালে ভোট পায়নি।

মনা মাস্টার মনে মনে বলে– সেই জন্যই তুমি সব সময় ঘুরঘুর কর ক্ষমতার কাছে কাছে। বঙ্গবন্ধুর সময় ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা সেজে যুবলীগের নেতা হয়েছিলে। জিয়াউর রহমানের সময় তার দলে। এরশাদের সময় তার দলে। আবার নব্বইয়ের গণ-আন্দোলনে যখন এরশাদের পতন হলো, ভিড়ে গেলে খালেদা জিয়ার কোলে।

এমপি এখন মনের কথা গলগলিয়ে বলে যাচ্ছে– আপনি তো জানেন, আমাদের দলের মহাসচিবও এক সময় বাম রাজনীতি করতেন। দারুণ সৎ মানুষ ছিলেন। আপনাদের মতোই। তিনি ভোটে দাঁড়িয়ে কোনোদিন দেড় হাজার ভোটও পাননি। আর এখন তাঁর বাক্সে পড়ে কমপক্ষে দেড় লাখ ভোট। একই মানুষ। শুধু দল চেঞ্জ করলেই পাবলিকের কাছে ফেরেশতা হয়ে যায়। অথচ খোঁজ নিলে দেখা যাবে আগেই তিনি ছিলেন সৎ। তখন ভোট পাননি। এখন অসততা শুরু করেছেন, ভোট পাওয়া শুরু করেছেন। বাংলাদেশের পাবলিক এই রকমই ভাই। ইম্‌ম্যাচিউর। এদের ফাঁকি দেওয়া সবচেয়ে সোজা। এছাড়া পাবলিকের সঙ্গে একটু দূরত্ব রাখতে হয়। পাবলিককে যদি আপনি আপনার খুব কাছাকাছি আসতে দ্যান, দেখবেন ওরা মনে করে এ তো আমাদেরই মতো। তখন আর আপনার কোনো দাম থাকবে না ওদের কাছে। ভোট টানতে হলে আপনাকে মিথ্ ছড়াতে হবে পাবলিকের মধ্যে। সত্যি হোক মিথ্যা হোক একটা মিথ্ আপনাকে ছড়াতে হবে। মনে আছে না আপনার, ঐ ব্রিটিশ আমলেও পাবলিকে বলত– লড়কে লিয়ে লাল ঝান্ডা, ভোটকে লিয়ে কংগ্রেস। মানে সেখানে ছিল গান্ধীর মিথ্।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মনা মাস্টার তিক্তস্বরে বলে– হ্যাঁ। এই অভিজ্ঞতা তো কিছু আমাদেরও হয়েছে।

এমপি-র উৎসাহ বেড়ে যায়– সেই জন্যই তো বলছি, আমাদের দলে চলে আসেন। আপনাদের মতো মেধাবী লোকের দরকার আছে আমাদের দলে। আমাদের ম্যাডাম মেধাবী লোকদের দারুণ পছন্দ করেন। আপনাকে অবশ্যই বড়ো পদ দেওয়া হবে। আর ভোটে জিতিয়ে আনার যাবতীয় ব্যবস্থা তো থাকবেই। না ভাই, এমপি পোস্ট আপনাকে আমি ছাড়ব না। তবে আপনি চাইলে আপনাকে উপজেলা চেয়ারম্যানের নমিনেশনের নিশ্চয়তা দিতে পারি। দ্যাখেন, ভাবনা-চিন্তা করে দ্যাখেন। যদি আপনাদের মতো লোকেরা দলে আসে, তাহলে রিফুজি শাহ আলমের মতো লোকেরা পাত্তা পাবে না। তখন আর ওরা গরিব লোকদের ওপর টর্চারেরও সুযোগ পাবে না।

বিদায় নেওয়ার সময় এমপি আরেকবার মনে করিয়ে দেয়– মানুষের উপকার করতে হলেও ক্ষমতা দরকার ভাই। কমিউনিস্ট পার্টির মতো দল করে আপনি কোনোদিনই ক্ষমতার নাগাল পাবেন না।

২০

রাতে পুরো বিবরণ শুনে ফিরোজা মন্তব্য করে– ঠিকই তো কইছে এমপি।

আর মনা মাস্টারের বিশ্বাসের ভিত পুরোপুরি কাঁপিয়ে দিয়ে পরদিন চন্দন বলে– এমপি-র বিশ্লেষণ ঠিক।

যেন ঠিকমতো শুনতে পায়নি এমন অবিশ্বাসের সাথে মনা মাস্টার বলে– কী বললি তুই!

চন্দন নির্বিকারভাবে বলে– আপনি ওদের দলে যোগ দেন আর না দেন, সেটা ভিন্ন প্রসঙ্গ। কিন্তু এদেশের পাবলিক সম্পর্কে এমপি যা বলেছে, তা ঠিকই বলেছে।

তুইও একথা বলছিস!

হ্যাঁ মনা ভাই। যে জনগণ শ্রদ্ধা পাওয়ার যোগ্য না তাকে মিথ্যা মিথ্যা শ্রদ্ধা জানাতে আমি আর রাজি নই।

তাহলে তুই এখন কী করবি? কী করতে চাস?

চন্দন উদাস স্বরে উত্তর করে– জানি না।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

২১

এখন রোজ সকালে ভয়ে ভয়ে চোখ মেলে মনা মাস্টার। ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে আয়না। কিন্তু তার ভয়কে পাত্তা না দিয়ে হুড়মুড় করে হাজির হয় আয়না। তীব্র বিদ্রুপের সাথে জিগ্যেস করে– একটু মনে করার চেষ্টা কর তো মাস্টার! তোমাদের পার্টির কোনো ডিসিশন কি কখনো নিচ থেকে নেওয়া হয়েছে? নাকি সবসময় ওপর থেকে সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে?

ভাবতে গিয়ে প্রায় বিষম খায় মনা মাস্টার। তাই তো! সবসময় সিদ্ধান্ত এসেছে ওপর থেকে। সিদ্ধান্তের সঙ্গে সঙ্গে ইনস্ট্রাকশন। যেভাবে যেভাবে তোমাকে বলা হলো, ঠিক সেইভাবে বলতে হবে তোমার নিচের স্তরের সবাইকে। যে যে যুক্তি দেওয়া হলো, তার বাইরে অন্য কোনো যুক্তি দেখানো চলবে না। কোনো প্রশ্ন তোলা যাবে না। প্রশ্ন তুললেই সেটা 'গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা'র খেলাপ হবে। তাই প্রশ্ন তুললেই তাকে কোণঠাসা করা হবে, একঘরে করা হবে। হয়েছেও তাই।

পার্টির খুব কম লোকই জানে যে আজকে যারা কমিউনিস্ট পার্টির বিলোপ চাইছে, তারা এটা আজ থেকে নয়। চাইছে অনেক আগে থেকেই। ১৯৮৭ সালেই তারা থিসিস উত্থাপন করেছিল। খোদ কমরেড ফরহাদ ছিলেন সেই থিসিসের উদ্যোক্তা। তবে সেটা উপস্থাপন করা হয়েছিল নূরুল ইসলাম নাহিদকে দিয়ে। তাঁরা বলেছিলেন যে কমিউনিস্ট পার্টি না রাখাই ভালো। বরং খোল-নলচে পালটে অন্য নামে একটি প্রগতিশীল দলে এটাকে রূপান্তরিত করা হোক।

সেই কমরেড ফরহাদ! যাকে সবাই পূজা করত বিপ্লবের ঋত্বিক বলে!

কিন্তু টিকি তো বাঁধা অন্য জায়গাতে। অতএব চলো মস্কো।

কে কে গেলেন?

গেলেন মোহাম্মদ ফরহাদ, নূরুল ইসলাম নাহিদ। সেই দলিলের সাথে ভিন্নমত পোষণকারী আব্দুস সালাম গেলেন। অনিল মুখার্জি চিকিৎসার জন্য আগে থেকেই সেখানে অবস্থান করছিলেন।

তবে কমিউনিস্ট পার্টি সেই সময় টিকে গেল। কারণ, মস্কোর মুরুব্বিরা বিকল্প প্রস্তাবকে গ্রহণ করলেন না।

আরও জানা গেল যে কমিউনিস্ট পার্টি উঠিয়ে দেওয়ার চিন্তা পার্টির ভেতরে সেই পঞ্চাশের দশক থেকেই ছিল। তাদের যুক্তি ছিল পূর্ব পাকিস্তান বা বাংলাদেশের দুর্বল অর্থনীতি, মুসলিমপ্রধান দেশ হিসেবে চিন্তার অনগ্রসরতা, শ্রমিক শ্রেণির অনুপস্থিতি, সামন্তবাদী ধ্যান-ধারণা– এইসবের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির অগ্রসর হওয়া খুব কঠিন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তারপরেও কমিউনিস্ট পার্টি এবং গণ-সংগঠনগুলো এগিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু নেতাদের মানসিকতা এগোচ্ছিল না কিছুতেই।

আয়নার ওপারের তীব্র চোখ দুটো তাকিয়ে ছিল তার দিকে। মনা মাস্টারের ভেতরটা পড়ে নিচ্ছিল সে বিনা আয়াসেই।

মনা মাস্টারের মুখে বেদনার ছাপ দেখেও সে রেহাই দেয় না। বলে– তোমরা এসব কথা কেন জানাওনি সর্বস্তরে?

নিষেধ ছিল।

আশ্চর্য! নেতাদের চেহারা তোমরা দেখতে পেলে। তারা যে বিপ্লব চায় না, কোনোদিন বিপ্লব করবে না, এটা তো তোমরা বুঝে গিয়েছিলে। তাহলে সেই নেতাদের হুকুমে মুখে কুলুপ এঁটে রইলে কেন?

মনা মাস্টার মিনমিন করে বলে– শুধু আমি তো না। কেউই মুখ খোলেনি।

এই একটা ব্যাপারে তোমাদের নেতারা অবশ্য শতভাগ সফল। হাজার হাজার কর্মীকে ভেড়া বানিয়ে রাখতে পেরেছে। তারা উঠতে বললে তোমরা উঠেছ, বসতে বললে বসেছ! বাহ্! বাহ্!

১৯৮৭ সালের পরেও সেই নেতারাই রইল মূল মঞ্চে। তারা একের পর এক ভুল সিদ্ধান্ত দিয়ে গেল এরশাদবিরোধী আন্দোলনকালে। সেই ভুলের বলি হলো ছাত্র ইউনিয়নের অনেক কর্মী। আন্দোলনকারী মিলিট্যান্ট ছাত্রদের টার্গেটে পরিণত হলো ছাত্র ইউনিয়ন। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস থেকে বের করে দেওয়া হলো ছাত্র ইউনিয়নের হাজার হাজার কর্মীকে। নিহত হলো কল্যাণপুরের আসলাম। সংখ্যায় অনেক বেশি, অনেক বড়ো হয়েও ছাত্র ইউনিয়ন কিছু করতে পারল না। তোমাদের পার্টির নেতারা করতে দিল না। বিরোধী সংগঠনগুলো আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করছিল, আঘাত-প্রত্যাঘাত করার জন্য প্রশিক্ষিত ক্যাডার ব্যবহার করছিল। কিন্তু ছাত্র ইউনিয়নকে ঠুঁটো জগন্নাথ করে রাখল তোমাদের পার্টি। কোনো গ্রুপ মিলিট্যান্ট হয়ে উঠতে চাইলেই সেটাকে তোমরা নিষ্ক্রিয় করে দিতে। সে ঢাকাতেই হোক, আর অন্য কোনো জেলাতেই হোক।

ছাত্র ইউনিয়ন বা যুব ইউনিয়ন মিলিট্যান্ট হয়ে উঠলে সেটা তোমাদের নেতাদের জন্যই হতো সবচেয়ে বেশি ভয়ের কারণ। তাদের ভয় ছিল, যেহেতু তাদের অবস্থানটা বিপ্লববিরোধী, সেটা জানতে পারলে ছাত্র-যুব সংগঠনের মিলিট্যান্সি ব্যবহৃত হতো তাদের বিপক্ষেই। আজকে তাদের নাকের পানি চোখের পানি এক করে দিত ছাত্ররা। সেই কারণেই পুরোটা সময় ছাত্র ইউনিয়নকে হারমোনিয়াম পার্টি আর গিনিপিগ বানিয়ে রাখলে তোমরা। অথচ ওদের মতো দুঃসাহসী ছেলে-মেয়ে অন্য কোনো সংগঠনে খুঁজে পাওয়া যাবে না। ওরা নিরস্ত্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অবস্থায় বারবার মুখোমুখি হয়েছে সশস্ত্র আক্রমণের। কিন্তু তবু সব ধরনের কর্মসূচি পালন করে গেছে। কখনোই পিছু হটেনি। প্রতিরক্ষামূলক হাতিয়ারও কমিউনিস্ট পার্টি ওদের কখনো ধরতে দেয়নি। একের পর এক আত্মাহুতি দিয়েছে ছেলেরা, লাঞ্ছিত হয়েছে। তবু সংগঠন ছেড়ে যায়নি। এই সত্যিকারের বিপ্লবী স্পিরিটকে আসলে সব সময় ভয়ই পেয়েছে তোমাদের পার্টিনেতারা। তাই সবসময় ওদের কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছে নিজেদের আসল উদ্দেশ্য।

ফ্যাঁসফেসে গলায় মনা মাস্টার বলে— এত কিছু ভাবিনি আমরা।

তা ভাববে কেন? ভাবার কাজ তো পুরোটাই তুলে দিয়েছিলে তোমাদের সেন্ট্রাল লিডারদের হাতে। আর সেই কারণে নিজেরা ভাবতে ভুলে গিয়েছিলে। তোমাদের ভাবনা-চিন্তা করার অভ্যাসটাই বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

এখান থেকে আরও একটা বিষয় বেরিয়ে আসছে।

কী?

আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ, যুবলীগ বছরের পর বছর ধরে তোমাদের পার্টির এবং গণ-সংগঠনের ওপর নানাভাবে হামলা চালিয়েছে, সেটাকে উপেক্ষা করে তোমরা আওয়ামী লীগ ডাকলেই ছুটে গেছ তার কাছে। ঐসব সন্ত্রাসের কোনো উত্তর দিতে দেয়নি তোমাদের নেতারা। কারণটা এখন পরিষ্কার। তারা তাদের নিজেদের জন্য আওয়ামী লীগকেই ঠিকানা বানিয়ে রেখেছিল বরাবর। দেখতে পাচ্ছ না কীভাবে দুদ্দাড় দৌড়াচ্ছে সবাই আওয়ামী লীগের দিকে!

কেউ কেউ তো বিএনপি-তেও গেছে!

তা তো যাবেই। বিএনপি এখন ক্ষমতাসীন দল। তাছাড়া তারা আবার ভেতরে ভেতরে তোমাদের জ্ঞানগম্যির প্রতি একটা সমীহ ভাব পোষণ করে। তাই বামদল থেকে কেউ গেলে কিছুটা উচ্চমূল্য পায় সেখানে। অন্যদিকে আওয়ামী লীগ তো ঐতিহাসিকভাবেই জানে যে মোল্লার দৌড় যেমন মসজিদ পর্যন্ত, তোমাদের দৌড় সেইরকম আওয়ামী লীগ পর্যন্ত। তা তুমি এখন কী করবে?

মনা মাস্টার সত্যি উত্তরটাই দেয়— জানি না।

২২

রাতে আবারও সেই আয়না।

তবে এখন আয়নার ওপারের মানুষটিকে অনেকখানি আত্মমগ্ন মনে হচ্ছে। কথা বলছে যেন নিজেরই সাথে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

একবার জিগ্যেস করে– তোমাদের নেতাদের প্রধান দোষ কী? কীভাবে তারা সত্য গোপন রেখেছে অন্য সবার কাছ থেকে? কীভাবেই-বা ভুল সত্য গিলিয়ে গেছে বছরের পর বছর ধরে?

নিজেই উত্তর দেয়– দুইভাবে। একটা হচ্ছে তারা বলশেভিক বিপ্লবের ইতিহাসটা এডিট করে তুলে ধরেছে সবার সামনে। অনেক মিথ্যে হয়তো তাতে নেই। তবে অনেক সত্য গোপন করা হয়েছে। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে কোনো নেতিবাচক তথ্য প্রকাশিত হলেই সেটিকে সিআইএ-র অপপ্রচার বলে উড়িয়ে দিয়েছে। তাদের কাছ থেকে তোমরাও সেই 'উড়িয়ে দেওয়া' শিখেছিলে খুব ভালোভাবে।

এই কথাগুলির পিঠে কোনো কথা আসে না মনা মাস্টারের মনে।

আয়নার ওপারের মানুষ বোধহয় তার উত্তরও শুনতে চায়নি। নিজের মনেই কথা বলে চলে সে– ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লব সম্পন্ন হলে বা বলশেভিকরা ক্ষমতায় গেলে ঠিক কীভাবে সমাজতন্ত্রের পথে যাত্রা শুরু হবে, তা সাথিদের কাউকে বলতে পারেননি লেনিন। এমন প্রশ্ন এলে তিনি বলতেন যে আগে ক্ষমতা দখল হোক, তারপর ঠিক করা যাবে আমাদের পদক্ষেপ।

অন্যদের মতো লেনিনও আশা করতেন যে অবিলম্বে পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলোতেও বিপ্লব সংঘটিত হবে। তখন সেই উন্নত দেশগুলোর শ্রমিক শ্রেণি রাশিয়ায় বিপ্লবকে সুরক্ষিত করার কাজে সহযোগিতা করবে। কিন্তু ঘটল ঠিক তার উলটোটা। রাশিয়াকে একাই বিপ্লব নির্মাণের কাজে অগ্রসর হতে হলো।

গ্রামাঞ্চলে অনেকটা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই জমিদারদের কাছ থেকে জমি দখল করে তা ক্ষুদ্র কৃষকদের মাঝে বিলিয়ে দিতে শুরু করেছিল বিপ্লবীরা। শহরেও শিল্পকারখানাগুলোর নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে ফেলল শ্রমিকদের সোভিয়েত। জাতীয়করণ করা শুরু হলো বড়ো প্রতিষ্ঠানগুলো।

কিন্তু প্রাথমিক উচ্ছ্বাস একটু থিতিয়ে যাওয়ার পরেই লেনিন জানালেন যে, তাদের অগ্রসর হতে হবে অন্য পথে। অনেক সাবধানে। ১৯১৮ সালের মার্চ-এপ্রিলে লেখা লেনিনের 'আজকের দিনে প্রধান করণীয়'র মধ্যে ছিল–

১. জাতীয়করণে বিরতি দিতে হবে।

২. যুদ্ধ পদ্ধতির পরিবর্তে প্রশাসনিক পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে।

৩. সব ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে মনোযোগ দিতে হবে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৪. দক্ষ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে। প্রয়োজনে বেশি বেতন দিয়ে হলেও বুর্জোয়াদের মধ্য থেকে দক্ষ ম্যানেজার নিয়োগ দিতে হবে।

৫. আধুনিক প্রযুক্তি আমদানি ও ব্যবহার করতে হবে।

৬. ব্যাংকের শাখা অনেক বৃদ্ধি করতে হবে। গ্রাহকদের জন্য ব্যাংকের লেন-দেন আরও সহজ করে দিতে হবে।

৭. প্রয়োজনবোধে উৎপাদন প্রতিষ্ঠানে একক ব্যক্তির কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে দিতে হবে। সেই একক কর্তৃত্ব প্রয়োজনে শ্রমিক সোভিয়েতের সিদ্ধান্ত অমান্য করারও ক্ষমতা ধারণ করবে।

৮. বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রতিযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি করতে হবে। ইনসেন্টিভের ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে শ্রমিকরা উৎপাদনবৃদ্ধিতে উৎসাহী হয়।

৯. আমলাতন্ত্রকে প্রতিহত করতে হবে।

১০. সকল শ্রমজীবীকে রাষ্ট্র পরিচালনায় সংযুক্ত করার লক্ষ্যে ধীরগতিতে এবং পর্যায়ক্রমে সংস্কারের পথে অগ্রসর হতে হবে।

মনা মাস্টার হাঁ হয়ে যায়। বলে কী! এ তো প্রায় একরকম পুঁজিবাদী ব্যবস্থাই। লেনিন এমন ধরনের চিন্তা করেছিলেন!

আয়নার ওপারের মানুষটি যেন আগেই জানত যে মনা মাস্টার এমন ধরনের প্রতিক্রিয়াই দেখাবে। সে ধৈর্য হারায় না। বলে চলে নিজের কথা– এমন একটি বিশাল বিপ্লবের পরে এই ধরনের কর্মসূচি নেহায়েতই নিরামিষ মনে হতে পারে। কিন্তু লেনিন নিশ্চিত ছিলেন যে, এই ধরনের কর্মসূচি না নিলে বিপ্লবকে রক্ষা করা যাবে না।

কিন্তু এই কর্মসূচি এগিয়ে নিতে পারলেন না লেনিন। বরং চলতে বাধ্য হলেন উলটোপথে।

কারণ, দেশের ভেতরে শুরু হলো প্রতিবিপ্লবীদের সাথে গৃহযুদ্ধ। আর সেই শত্রুবাহিনীর সাথে সরাসরি যোগ দিল উন্নত ১৬টি দেশের সৈন্য এবং অস্ত্র। তখন আর পরিস্থিতি অনুযায়ী এগিয়ে যাওয়া ছাড়া পথ রইল না বলশেভিকদের।

জাতীয়করণ বন্ধ করতে চেয়েছিলেন লেনিন। কিন্তু কাজের বেলায় এটি বাড়িয়ে দিতে হলো। কারণ, প্রতিবিপ্লবী শ্বেতবাহিনীর দখলে গেলে এইসব প্রতিষ্ঠান হাতছাড়া হয়ে যাবে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আর শহরের কলকারখানায় উৎপাদন বন্ধ হয়ে গেল। শহরের মানুষ আর লালফৌজ তখন খাবে কী? পুরো চাপ গিয়ে পড়ল কৃষকের ওপর। তাদের কাছ থেকে জোর করে কেড়ে নেওয়া শুরু হলো অতিরিক্ত খাদ্যশস্য। এটাকে বলা হলো 'শস্য লেভি'। তার অর্থ হচ্ছে বিনিময়ে কিছু না দিয়েই কৃষকের কাছ থেকে উদ্বৃত্ত শস্য কেড়ে নেওয়া।

'যুদ্ধ পদ্ধতি' থেকে 'প্রশাসনিক পদ্ধতি'তে ফিরে যাওয়ার বদলে আরও বেশি করে যুদ্ধ পদ্ধতিই সর্বব্যাপী হয়ে উঠল। ১৯১৮ সালের গ্রীষ্মে মেনশেভিক পার্টির ফানিয়া কাপলান নামক একজন কর্মী লেনিনকে হত্যার চেষ্টা করলে তাদের সাথে বলশেভিক পার্টি সব ধরনের সমঝোতা থেকে সরে আসে। শুরু হয় 'শ্বেত সন্ত্রাসে'র জবাবে 'লাল সন্ত্রাস'।

এইসব কার্যক্রমকে বলা হতো 'যুদ্ধ কমিউনিজম'।

তবে অচিরেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে এইভাবে 'যুদ্ধ কমিউনিজম' চালিয়ে যাওয়া উচিতও নয়, সম্ভবও নয়।

ট্রটস্কি ১৯২০ সালেই 'শস্য লেভি' প্রথা বিলুপ্ত করার দাবি জানালেন। তার বদলে তিনি চালু করার পরামর্শ দিলেন 'শস্য কর'। কিন্তু বলশেভিক পার্টিতে তাঁর প্রস্তাব গৃহীত হলো না।

গ্রামাঞ্চলে কৃষকরা পুরোপুরি চলে গেল বলশেভিকদের বিপক্ষে। তারা বলতে শুরু করল যে এখন তারা নতুন করে 'ভূমিদাস' হয়ে গেছে। সেনাবাহিনী এবং অন্যান্য বাহিনীতে সাধারণ সৈনিক হিসেবে যারা আছে, তারা তো গরিব কৃষকেরই সন্তান। তারাও ক্ষোভে ফেটে পড়ল। ১৯২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে 'কর্নস্তাদ' নৌঘাঁটির সৈনিক এবং নাবিকরা বিদ্রোহ করল। তারা দাবি করল– সোভিয়েতগুলো থেকে বলশেভিকদের বাদ দিতে হবে।

তখন লেনিন চালু করেন নয়া অর্থনৈতিক পদ্ধতি বা নিউ ইকোনমিক পলিসি। যাকে সংক্ষেপে 'নেপ' বলা হয়। এই নীতি অনুযায়ী সরকারি একচেটিয়া ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে ব্যক্তিগত বাণিজ্যের সুযোগ উন্মোচিত হয়। শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে ব্যক্তি-মালিকানার সুযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগেরও অনুমতি দেওয়া হয়। এই নীতির ফলে রাশিয়ার অর্থনীতি পুনরায় জীবন ফিরে পেতে থাকে।

কিন্তু আবার সবকিছু উলটে গেল লেনিনের মৃত্যু এবং স্তালিনের ক্ষমতাদখলের সাথে সাথে।

স্তালিন আবার সবকিছু রাষ্ট্রীয়করণ করলেন। ভূমির ওপর থেকে কৃষকের অধিকার কেড়ে নিয়ে জোর করে 'যৌথ খামার' ব্যবস্থা চালু করলেন। এর ফলে উজাড় হলো গ্রামের পর গ্রাম। নীরব দুর্ভিক্ষে প্রাণ হারাল ৭০ লক্ষ মানুষ।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মনা মাস্টার হাঁ হয়ে যায়– এসব কি সত্যি? আমরা তো শুনেছি এসব হচ্ছে সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ঘৃণ্য প্রচারণা।

হ্যাঁ এসব সত্যি। স-ব সত্যি। এটি তোমাদের নেতারা জানত। তারা মুখে কুলুপ এঁটে থাকত। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পরে যদি শেখ মুজিবকে এইসব কথা তোমাদের নেতারা মনে করিয়ে দিতেন, তাহলে তিনি হয়তো নির্বিচার জাতীয়করণের দিকে ঝুঁকতেন না। হয়তো ১৯৭৫ সালে একদলীয় শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কথাও পুনর্বিবেচনা করতেন।

কিন্তু তোমরা এইসব কথা মনে রেখ। তোমাদের নতুন প্রজন্মের বিপ্লবীদের এই সত্যগুলো জানিয়ে দিয়ো। তারা ভুল এড়িয়ে চলতে পারবে।

অনেক দ্বিধা মনা মাস্টারের মনে। ভবিষ্যতে কী ঘটবে সে তা আন্দাজও করতে পারে না তেমন। এখনকার প্রজন্ম ঠিক কী যে চায়, সেটাও সে খুব ভালো করে বুঝতে পারে না।

২৩

কিন্তু ফরহাদ জানে সে কী চায়। তার পরিষ্কার কথা– যারা পার্টি করবে না, তারা চলে যাক। ইচ্ছা হলে অন্য দল করুক, ইচ্ছা হলে রাজনীতি থেকে অবসর নিক। কিন্তু তারা পার্টির অফিস ভাগ করতে আসে কোন যুক্তিতে? আর যারা এখনও পার্টিতে আছে, পার্টি টিকিয়ে রাখতে চায়, তারাই বা ভাগবাঁটোয়ারার ব্যাপারে রাজি হয় কোন যুক্তিতে?

হায়রে, হাটে হাটে কৌটা হাতে লইয়া ঘুরছি! দোকানে দোকানে গেছি। চালঅলা, মাছঅলা, সবজিঅলার কাছ থাইকা চান্দা তুলছি। কইছি, ভাইরে, আমরার পার্টি গরিব মাইনষের পার্টি। বড়োলোকদের বিরুদ্ধের পার্টি। রাজা-জমিন্দারের বিরুদ্ধের পার্টি। বড়োলোকরা তো আর আমরারে ট্যাকা দিব না। আপনেরা গরিবরা, গরিবের এই পার্টিকে ট্যাকা দ্যান। এক ট্যাকা পারলে এক ট্যাকা দ্যান, না পারলে সিকি-আধলি যা পারেন দ্যান। বড়োলোকের অনেক পার্টি। গরিবের পার্টি এই একখানই। এই পার্টি ছাড়া গরিবের কতা কেউ কইবো না। এই পার্টি ছাড়া গরিবের পাশে কেউ খাড়াইবো না।

সেই ট্যাকা ভাগ করবার চায় অরা! দিমু না। কিছুতেই দিমু না!

আচ্ছা এইসব লোকগুলানরে কেন্দ্রীয় কমিটির নেতা বানাইল কেডা?

তখন ফরহাদ খেয়াল করে, জীবনে এই প্রথম খেয়াল করে, পার্টির পদ্ধতির মধ্যে গণতন্ত্র বলতে কিছু নাই। কোনোদিন ছিল না। কোনো স্তরেই গণতন্ত্রের কোনো প্র্যাকটিস ছিল না। কয়েকজনই ঠিক করে দিত, কে-কী হবে। সাবজেক্ট

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কমিটির নামে কয়েকজনের হাতে তুলে দেওয়া হতো কমিটি গঠনের ভার। তারা নিজেদের মতো করে কমিটি বানাত। আর সারা দেশের ডেলিগেটরা হাততালি দিয়ে দিয়ে কমিটি পাশ করে যে যার মতো ফিরে যেত। কারও কারও মনে খুঁতখুঁতি থাকত। আরে, অমুক তো পার্টির আন্দোলন-সংগ্রামে তেমন অংশ নেয় না। কেবল নেতাদের সাথে সাথে ঘুরেফিরে বেড়ায়। সে কীভাবে কমিটিতে জায়গা পায়? জেলা কমিটিও তাই। জায়গা পাওয়ার জন্য আন্দোলন-সংগ্রাম-সংগঠনের কাজ করার চাইতে কে কোন নেতার কাছের মানুষ, সেটাই বড়ো যোগ্যতা। সাবজেক্ট কমিটির নামে বানানো লোকদের বানিয়ে দেওয়া কমিটি। পার্টি এই নিয়ম কি নিয়েছে সোভিয়েত পার্টির দেখাদেখি?

এই নিয়ম কবে থেকে? লেনিনের সময় থেকেই? নাকি স্তালিনের আমল থেকে?

পার্টির মধ্যেই পালটা প্ল্যাটফরমের অধিকার চিরকাল ভোগ করে আসছিলেন বলশেভিক পার্টির সদস্যরা। বক্তব্য যদি নীতিভিত্তিক হয়, তাহলে যেকোনো সদস্যের অধিকার ছিল অন্য সদস্যদের সেই মতের স্বপক্ষে টেনে আনার। পার্টি-প্রদত্ত কাজ করতে যেকোনো সদস্য বাধ্য কিন্তু তার বিশ্বাস তার নিজস্ব– এটাই ছিল চিরদিন কমিউনিস্টদের নীতি।

মতামতের বৈচিত্র্যই হচ্ছে একটা বিপ্লবী পার্টির মূল জীবনীশক্তি। মতামতের অভিন্নতা তাসের দেশে চলে, কমিউনিস্ট পার্টিতে নয়। অথচ দশম কংগ্রেসে এই রকম একটা অ-কমিউনিস্টসুলভ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো।

এই রকম অবস্থায় বশংবদ জি হুজুরের দলের হয় পোয়াবারো। পার্টির কাজ করার দরকার নেই, পড়াশোনা করার দরকার নেই, কেবলমাত্র নেতার নামে জয়ধ্বনি আর নেতার পা চাটলেই উপরে উঠার সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে উঠে যাওয়ার সুযোগ খুলে যায়। এই সুযোগ সবচাইতে বেশি নিয়েছে আমলারা। পার্টির মধ্যে কোনো নিবেদিতপ্রাণ পার্টিকর্মী নয়, আমলাদের গুরুত্বই বেশি হয়ে গিয়েছিল। সংখ্যাও ছিল মারাত্মক রকমের বেশি। তারাই গঠন করল নানা ধরনের গোপন পুলিশ ও বাহিনী। এইসব বাহিনী যে কার কাছে জবাবদিহি করত, তা কেউ জানত না।

আর সেইসঙ্গে পরস্পরের ওপর জমে উঠেছিল সন্দেহ। ট্রটস্কি দীর্ঘদিন লেনিনের বিরোধিতা করেছিলেন বিপ্লবের আগে। অথচ 'দুনিয়া কাঁপানো দশদিনে' তাঁর ভূমিকাই ছিল সবচাইতে উজ্জ্বল। এখন বিপ্লবে ট্রটস্কির অবদানের কথা ভুলে গিয়ে তাঁর লেনিন-বিরোধিতার কথাই সামনে উঠে আসছিল বারবার।

বুখারিন ১৯১৮ সালে এক সভায় লেনিনের বিরোধিতা করেছিলেন এবং এক পর্যায়ে লেনিনকে গ্রেফতার করারও প্রস্তাব করেছিলেন। এখন সেটাই সামনে চলে

~ www.amarboi.com ~

এলো। ১৯১৭ সালের বিপ্লবের পরিকল্পনা পত্রিকায় ফাঁস করে দিয়েছিলেন কামেনেভ এবং জিনোভিয়েভ। এতে জীবন হারিয়েছিলেন কয়েক হাজার বিপ্লবী। এখন তাদের অবদানের কথা বাদ দিয়ে বারবার সেই তথ্য ফাঁসের অভিযোগই সামনে আসত থাকল।

এই সবকিছুই ঘটতে পেরেছিল পার্টির ভেতরে গণতন্ত্র না থাকার কারণে।

নতুন সোভিয়েত দেশে রাষ্ট্রযন্ত্র যেন সমাজের ভৃত্য থেকে সমাজের প্রভুতে না পরিণত হয়, সেই লক্ষ্যে লেনিন 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' বইতে সুস্পষ্ট তিনটি কর্মসূচি ঘোষণা করেছিলেন ১. সব কর্মচারী জনগণের ভোটে নির্বাচিত হবেন এবং যেকোনো সময় তাঁকে ভোট দিয়ে বরখাস্ত করা যাবে। ২. একজন সাধারণ শ্রমিকের চাইতে বেশি মজুরি কেউ পাবে না। ৩. একসময় জনতাই সরকারি ক্ষমতার অংশীদার হবেন। অর্থাৎ জনতাই আমলার কাজ করবেন, ফলে আর কোনো আমলাই থাকবে না।

কিন্তু দেখা গেল, লেনিন নয়, স্তালিন নয়, ট্রটস্কি নয়– পার্টির মধ্যে সবচাইতে ক্ষমতাশালী থেকে গেল সেই আমলাতন্ত্রই। ট্রটস্কি তখন বলেছিলেন– 'ঠিক তাই ঘটেছে। রাষ্ট্রযন্ত্রের আমলারা সবাইকে পরাজিত করেছে– পার্টিকে, পার্টির মধ্যেকার বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীকে এবং লেনিনকে। এবং এই পরাজয় ধ্যানধারণা বা তর্কের মাধ্যমে ঘটেনি, ঘটেছে আমলাতন্ত্রের সামাজিক ওজনের চাপে। বিপ্লবের মাথার চেয়ে তার পশ্চাদ্দেশ ঢের বেশি গুরুভার প্রতিপন্ন হয়েছে।'

ফরহাদ বিড়বিড় করে বলে– থুঃ! এই ছিল আমরার দ্যাশের পার্টি! শালা পার্টি তো না, নিজেই একটা আমলাতন্ত্র।

তারেক নামের একটি ছেলে এসে দাঁড়ায় ফরহাদের পাশে। বলে– এইভাবে দিনরাত ধরনা দিয়ে বসে থেকে কী লাভ ফরহাদ ভাই? তার চেয়ে বাড়ি ফিরে যান। নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করেন।

ফরহাদ তার দিকে ফাঁকা দৃষ্টিতে তাকায়– বাড়িত ফিরব কীভাবে ভাই! বউ-সন্তানদের বঞ্চিত করছি পার্টির নামে। মানুষরে বড়ো বড়ো আশা দিছি পার্টির নামে। কইছি যে বিপ্লব হইলে এই হইব সেই হইব! কত মানুষের সাথে তর্ক করছি। কত আত্মীয়স্বজনরে পর বানাইছি পার্টির জন্যে! এখন আমি কুন মুখে দাঁড়াব তারারে সামনে! আমার বাড়ি তো বাড়ি নাই। আমার গ্রাম তো আর আমার গ্রাম নাই!

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

২৪

এবারের ডিসেম্বরে পাতা যতটা ঝরে, ধুলো ততটা ওড়ে না। হেমন্ত ছিল অনেকখানি লম্বা। তাই বোধহয় উত্তরের বাতাস এবার অনেক কম। কেমন যেন দমচাপা গুমোট একটা বিষণ্ন পরিবেশ। মনা মাস্টার তার বাইরের পুরো জীবনটাকে সংসারী জীবনের চৌহদ্দিতে ঠেসে ঢুকানোর আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এখনও। মনটা তবু রক্তাক্ত হয় দিনে-রাতে বারবার। অনেকটা দৈববাদীর মতো প্রত্যাশা নিয়ে সে অপেক্ষা করে, কিছু একটা ঘটবে। কিছু একটা, যা ভালো, যা উৎসাহব্যঞ্জক, যা তাকে জীবনের প্রতি আবার আশা নিয়ে তাকাতে সাহায্য করবে। কিন্তু কোনো ভালো খবর তো আসেই না, বরং খারাপ খবর থেকে মুখ লুকিয়ে থাকার জন্য তাকে রীতিমতো কসরত করতে হয়। দিনে দিনে স্বল্পবাক হতে হতে এখন মনা মাস্টার নেহায়েত প্রয়োজনীয় কথা ছাড়া এমনকি স্ত্রী-কন্যার সাথেও বাক্যালাপ করে না বললেই চলে। কিছুদিন এভাবে চলে। তারপরে মনা মাস্টার আবার সচেতন হয়ে ওঠে। স্ত্রী-কন্যার সাথে অহেতুক শীতল আচরণের জন্য অনুতাপবিদ্ধ হয়। তখন কিছুদিন বাড়তি উষ্ণ আচরণ দিয়ে তাদের ক্ষতিপূরণের চেষ্টা করে। সিমি বুঝতে পারে না। বাবার সাথে সাথে সে-ও দারুণ উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। কিন্তু ফিরোজা স্বামীর হৃদয়ের রক্তক্ষরণ ঠিকই টের পায়। বুঝতে পারে স্বামীর এই চেষ্টাকৃত উৎফুল্লতা তাকে ভেতরে ভেতরে আরও বেশি ক্লান্ত করে তুলছে। যেকোনো মুহূর্তে আবার স্বল্পবাক্‌প্রবণতায় আক্রান্ত হয়ে পড়বে মনা মাস্টার। তাই সে ভয়ে ভয়ে থাকে।

পুরানো সময়ের সাথিরা এখন আর কেউ-ই তেমন দেখা করতে আসে না মনা মাস্টারের সাথে। আসলে তাদের সম্পর্ক তো ছিল কাজের, আন্দোলনের। এখন কাজ নেই। আন্দোলন নেই। অথচ দেশে আন্দোলনের ইস্যুর কোনো অভাব নেই। মিল-কলকারখানা একের পর এক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বিশ্বব্যাংকের চাপে, মন্ত্রী-আমলারা টাকা খেয়ে দেশের তেল-গ্যাস বিদেশি কোম্পানির হাতে তুলে দিতে উঠেপড়ে লেগেছে, সোনালি আঁশ পাট এখন কৃষকের গলার ফাঁসে পরিণত হয়েছে, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বাড়ছেই আর মন্ত্রীরা বলছে তাতে কোনো ক্ষতি নেই কারণ মানুষের নাকি ক্রয়ক্ষমতা অনেক বেড়ে গেছে, ব্যাংক-বিমা তুলে দেওয়া হচ্ছে বেসরকারি খাতে আর তারা ছাঁটাই করছে লোকজনদের ইচ্ছামতো। এত এত সব অবিচার নির্বিচারে সয়ে যাচ্ছে মানুষ। মনা মাস্টারও ভাবে তাদের এমপি-র কথাই বোধহয় ঠিক। এদেশের অপরিণত জনগণ চিরদিন অপরিণতই থাকবে, নিজেদের শত্রু-মিত্র কোনোদিনই চিনে নিতে পারবে না।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এখন মনের বিবশতা শরীরেও ভর করেছে মনা মাস্টারের। গা ম্যাজম্যাজ করে মাঝে মাঝেই। স্কুল কামাই দেয় শরীর খারাপের অজুহাতে। আজও সেই রকমই চলছে। স্কুলে তো যায়ই-নি, সারাদিনই বের হয়নি বাড়ি থেকে। এ-বই সে-বই একটু উলটেপালটে দেখেছে, কিন্তু পড়া যাকে বলে তা আর আদৌ হয়ে ওঠে না ইদানীং। তাই বই নাড়াচাড়ার ফাঁকে ফাঁকে মূলত ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে কাটিয়েছে সারাদিন। সন্ধ্যায় তাকে চা দিয়ে ফিরোজা গেছে মেয়েকে নিয়ে পাশের বাড়িতে টেলিভিশন দেখতে। এই এক নেশা হয়েছে ফিরোজার। সন্ধের পরে বেরিয়ে যায়, ফিরে আসে রাত সাড়ে আটটার দিকে। নাটক দেখে আর খবর দেখে। ওর কাছ থেকে কিছু কিছু খবর জানতে পারে মনা মাস্টার।

আজ ফিরোজা ফিরে আসে উত্তেজিত হয়ে– শুনছ, কী সর্বনাশা কাণ্ড! ইন্ডিয়াত হিন্দুরা ভাঙে ফেলিছে একখান মসজিদ। কী যেন নাম বলল মসজিদটার! বোধহয় বাবরি মসজিদ।

তেমন একটা গা করল না মনা মাস্টার। এই তো চলবে এখন বিশ্বজুড়ে। মানুষ ভাত-কাপড়-শিক্ষা-কাজের আন্দোলন ছেড়ে এখন মেতেছে ধর্ম নিয়ে। কার ধর্ম এখন বেশি বড়ো, তা দেখানোর প্রতিযোগিতায় নেমেছে মানুষ। সোনা ছেড়ে গিল্টির পেছনে ছুটছে। ছুটুক। মনা মাস্টার মোটেই উৎসাহ দেখায় না খবরটা শুনে। খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়তে যায় আবার। তখনই বিদ্যুচ্চমকের মতো মনে আসে একটা আশঙ্কার কথা– ইন্ডিয়াতে মসজিদ ভাঙা নিয়ে এখানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধানোর চেষ্ট করবে না তো জামাত! নিশ্চয়ই করবে। তাহলে এখন উপায়! কাদের নিয়ে ঠেকানো যাবে এই সর্বনাশ!

ধড়মড় করে উঠে বসে মনা মাস্টার। আলনা থেকে গায়ের চাদরটা টেনে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে। পেছনে পেছনে বারান্দায় আসে ফিরোজা– কী হলো, এত রাতে যাও কোথায়?

অস্ফুটে বলে মনা মাস্টার– হিন্দু পাড়ায়। ওদের সাবধানে থাকতে বলা দরকার। যেকোনো মুহূর্তে হামলা হতে পারে হিন্দু পাড়ায়।

হনহন করে হাঁটতে হাঁটতে শীতের রাতেও কপালে ঘাম বেরিয়ে আসে মনা মাস্টারের। শুধু ঐ পাড়ার লোকদের সাবধান করে দিলেই তো হবে না। ওদের পাশে দাঁড়ানোর মতো আরও লোক দরকার। নব্বই সালের কথা মনে পড়ে তার। ক্ষমতা রক্ষার শেষ চেষ্টা হিসেবে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা বাধানোর চেষ্টা করেছিল এরশাদ। কিন্তু সফল হয়নি। এই এলাকায় তো কমিউনিস্ট পার্টি একাই যথেষ্ট

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ছিল। কেউ সাহসই পায়নি সংখ্যালঘুদের দিকে আঙুল তোলার। অথচ আজকের পরিস্থিতি কত আলাদা। হয়তো কেউ পাশে এসে দাঁড়াবে না সংখ্যালঘুদের।

হিন্দু পাড়ার কাছাকাছি প্রায় পৌঁছে গেছে মনা মাস্টার। হঠাৎ দুই-তিনটা টর্চের জোরালো আলো এসে পড়ল তার মুখে– খবরদার! কে যায়!

টর্চের পেছন থেকে ধমক আসে। মনে মনে কেঁপে ওঠে মনা মাস্টার। তাহলে কী সর্বনাশ যা হওয়ার ইতোমধ্যেই হয়ে গেছে!

হঠাৎ টর্চধারী কেউ একজন চেঁচিয়ে ওঠে– আরে এ যে মনা ভাই। কমরেড মনা মাস্টার।

তাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে নিয়ে যায় ওরা। আলোতে পৌঁছে মনা মাস্টার দেখে আফাজ, লোকমান, রবি, স্বপন, আনোয়ার। আরও অনেকে। সব তাদের পুরাতন পার্টির কর্মী। আর তাদের পাশে পরম নির্ভরতা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে হিন্দুপাড়ার যুবকদের দল। ঝিরঝিরে স্বস্তির পরশ নামে মনা মাস্টারের মনে। মানুষের ওপর তাহলে এখনও বিশ্বাস রাখা যায়।

২৫

এই বয়সেই বর্তমান আর ভবিষ্যৎ ফেলে অতীতের কথা ভাবতে হচ্ছে! নিজের অবস্থা ভেবে নিজে নিজে হেসে ফেলে চন্দন। উপায় নেই। নিজের শৈশব-কৈশোর-তারুণ্যের দিকে তাকাতেই হয় তাকে। তবে এটা সে বুঝে গেছে যে অতীতের কাছেই হাত পাততে হবে ভবিষ্যতের সাহস সঞ্চয়ের জন্য। আর অতীতের দিকে তাকালেই রূপকথার মতো লাগে সব।

জলকলের ডানপাশ দিয়ে আইয়ুব খানের বানানো ষাট-ফুটি পিচপাথরের রাস্তা দূরের জেলার দিকে রওনা দিয়ে ঠিক উপজেলা পরিষদের তোরণের সামনে মিলেছে পাগলা রাজার রাস্তার সাথে। পাগলা রাজার রাস্তা লম্বালম্বিভাবে –বশ্য বেশি বড়ো নয়, তবে বিস্তারে আইয়ুব খানের রাস্তার সাথে ভালোভাবেই পাল্লা দেয়। পুরানো লোকেরা এই বলে গল্প শোনাতে পছন্দ করে যে, এই রাস্তায় রাজার ছয় হাতি পাশাপাশি হাঁটত মাহুতের তত্ত্বাবধানে বৈকালিক ভ্রমণে বেরিয়ে। শহরের ঘোষপাড়ার প্রতিষ্ঠাতা আদি ঘোষের ঘি খাঁটি না ভেজাল মেশানো তা নির্ণয় করেছিল রাজার কোনো এক হাতিই। খাঁটি ঘি নাকি হাতির পুং জননাঙ্গে মালিশ করার সঙ্গে সঙ্গে হাতি পেচ্ছাপ করে দেয়। এটা নাকি হাতিসমাজের এক মহান বৈশিষ্ট্য। তো খাঁটি ঘি তৈরির সুবাদে হাতির পেচ্ছাপ করায় রাজা প্রীত হয়ে নিজে রাজবাড়ির জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ ঘি পারিতোষিকসহ সংগ্রহ করার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পাশাপাশি নারদ নদের দক্ষিণ পাড়ে ঘোষপাড়া প্রতিষ্ঠার অনুমতি দিয়েছিলেন। রাজার রাস্তায় এখন হাতির চলাচল থাকার প্রশ্নই ওঠে না। তবে মনুষ্য চলাচল এখনও একটি প্রবহমান বাস্তবতা। পাগলা রাজার রাস্তার দুধারে শিরিষ গাছের সারি। হাঁটতে গেলে যদি মৃদুমন্দ বাতাস থাকে তাহলে শিরীষসংগীত শোনা যেত নিশ্চিত। যেত বলার কারণ– এখন আর ঐ শিরীষ গাছগুলো নেই। স্বাধীনতার ঘোষক দাবিদার যখন প্রথম মিলিটারি আইন প্রশাসকের দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিলেন, তিনি নাকি পাগলা রাজার রাস্তা সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। উদ্যোগের চিহ্নস্বরূপ কাটা হয় শিরীষবৃক্ষগুলো। বাকি কাজ আর এগোয়নি। ফলে পাগলা রাজার রাস্তা ধরে হাঁটতে গেলেও আমাদের প্রাক্‌যৌবন আর শিরীষের শিরশির ধ্বনিতে মোহিত হওয়ার সুযোগ পেত না। উপজেলা পরিষদ থেকে দক্ষিণ দিকে রওনা দিয়ে জলকলের বামপাশ দিয়ে হর্টিকালচার প্রজেক্ট পেরিয়ে ডোমপাড়া মাঠের কালভার্ট পর্যন্ত পৌঁছতেই শেষ হয়ে যায় সেই রাস্তা। কালভার্ট থেকে সরু ইট-কংক্রিটের আধুনিক রাস্তা। রাস্তার দুই ধারে বনলতা বালিকা বিদ্যালয়, সমবায় বিভাগের অফিস, রাজা প্রতিষ্ঠিত দাতব্য চিকিৎসালয় যা এখন উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র, নতুন নতুন বসতবাড়ি, ফার্নিচারের কারখানা, বরফ কল, নগরবাসীর মননচর্চার চিহ্ন হিসেবে গড়ে ওঠা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের পাশে ডা. কায়েসউদ্দিনের বিষণ্ন হোমিওপ্যাথির দোকান; সেখানেই আমি জীবনে প্রথম একজন কমিউনিস্টকে চাক্ষুষ করি 'দৈনিক সংবাদ' পাঠরত অবস্থায়।

তখন দৈনিক ইত্তেফাকের রমরমা। বাড়িতে পেপার রাখা হবে, এতখানি জাতে তখনও ওঠেনি আমাদের পরিবার। এখনও অবশ্য পেপারের বিল মাসে মাসে বাকি পড়ে। পাড়াতে চায়ের দোকান দুটি। একজনের নাম নবাব আলি, অন্যজনের নাম বাবু মিয়া। রাজরাজড়ার শহরে একজন নবাব অন্যজন বাবু। তারা উভয়েই কিছুটা মরমিয়া ধরনের। বুঝে ফেলেছিল চায়ের দোকান চালিয়ে তাদের সংসারের অবস্থা আর যাই হোক, রমরমা হয়ে উঠবে না। তাই দোকান চালালেও তাদের মধ্যে গা-ছাড়া ভাব। দুই দোকানেই একজন করে ছোকরা কর্মচারী। তারাই চা বানায়, কাপ মাজে, মাটি আর শিক দিয়ে তৈরি চুলায় দৈলা গুঁজে দেয়। বাবু আর নবাব মোটামুটি খদ্দেরদের কাছ থেকে পয়সাকড়ি বুঝে নেয় আর বাকি-টাকির হিসাব রাখে। তো দুই দোকানেই দৈনিক ইত্তেফাক। কিছুদিন রাজনীতি করা পাড়ার স্বনামখ্যাত জুয়াড়ি সিরাজুল চাচা আমাদের সেই সেভেন-এইটে পড়া বয়সেই বুঝিয়ে দিয়েছিল পেপারের শাঁস হচ্ছে তার উপসম্পাদকীয় কলাম। তখন উপসম্পাদকীয় লেখে স্পষ্টভাষী, লুব্ধক, সুহৃদ প্রভৃতি নামের আড়ালে অতি জ্ঞানী ব্যক্তিরা। বিভিন্ন বিষয়ে লেখা হয় উপসম্পাদকীয়। কিন্তু

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

একটি বিষয় থাকবেই। তা হচ্ছে কমিউনিস্টদের গালি দেওয়া। সেইসঙ্গে বোঝানোর চেষ্টা করা যে, কমিউনিস্টরা হচ্ছে ভয়ানক মানুষ, দেশের এবং জাতির ধ্বংসই কমিউনিস্টদের একমাত্র ধ্যানজ্ঞান, এমনকি মিলিটারিও ভয় পায় কমিউনিস্টদের।

সিরাজুল চাচার কাছে জানতে চেয়েছিলাম, আমাদের শহরে কমিউনিস্ট আছে কি না। উনি নাম বলেছিলেন এবং ঘটনাক্রমে একদিন হোমিওপ্যাথির দোকানে বসে থাকা কমিউনিস্টকে দেখিয়েও দিলেন।

আমি তো থ!

এই লোক নাকি ভংয়কর!

নিরীহ গোবেচারা গোছের মানুষ, মাঝারি উচ্চতা, বয়স প্রৌঢ়ত্ব ছুঁয়েছে, মুখে সরলতার ছাপ, হেসে হেসে গল্প করছে ডাক্তারের দোকানের বেঞ্চিতে বসে থাকা আরও জনাতিনেক লোকের সঙ্গে। হাতে দৈনিক সংবাদ।

প্রাক্‌তারুণ্যের ঐ বয়সে, ঐদিনই আমি বুঝে গেলাম যে, কোনো একটি মিথ্যার সামনে আমি দাঁড়িয়ে আছি। হয় ঐ কমিউনিস্ট লোকটি মিথ্যা; না হয় দৈনিক ইত্তেফাক মিথ্যা।

কারণ কয়েকদিন আগেই, যখন পাগলা রাজার রাস্তায় শিরীষবৃক্ষ নিধনপর্ব চলছিল, ঐ লোকটাকে দেখেছিলাম বৃক্ষনিধনের প্রতিবাদে বাড়ি বাড়ি ঘুরে স্বাক্ষর সংগ্রহ করতে। বৃক্ষের প্রতিও যাদের এত ভালোবাসা তারা মানবজাতির এত বড়ো দুশমন হয় কীভাবে?

উত্তর অনেক পরে জেনেছি। প্রচলিত মনের মানুষদের কাছে তারা ভীষণ বিপজ্জনক। কারণ তারা স্বপ্ন দেখায়। তার চাইতেও বিপজ্জনক হচ্ছে– সেই স্বপ্নগুলো বাস্তব।

ননী ভৌমিকও সেই রকমই একজন কমিউনিস্ট এবং তিনি বাস্তবের বর্ণনা দিয়েই মানুষকে স্বপ্ন দেখাতে পারতেন। আরও বেশি করে পারতেন। আরও বেশি ভালোভাবে পারতেন। কারণ তিনি লেখক; সৃষ্টিশীল লেখক।

ছোটোবেলা থেকেই বিদেশ আমাদের কাছে স্বপ্নঘেরা থাকে। বাড়ি এবং মহল্লার বাপ-জ্যাঠা-মামারা নিজেদের মধ্যে যখন কথা বলেন, তাঁদের কণ্ঠ থেকে প্রায়শই একটা ক্ষোভ ফুটে বেরোয় যে বিদেশের তুলনায় আমাদের দেশটি হতচ্ছাড়া রকমের দরিদ্র, অনুন্নত এবং পিছিয়ে পড়া। তাই সেই কৈশোর থেকেই আমরা আমাদের দেশকে নিয়ে হীনম্মন্যতায় ভুগতে শুরু

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

করি। আমেরিকায় এই আছে, সেই আছে, প্যারিসে এই আছে, আর বিলাতের তো কথাই নেই। আর আমাদের এই পোড়ার দেশে আছেটা কী? তাই তাদের সকলেরই কামনা, আমাদের এই দেশটাও যদি আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের ছোঁয়ায় ঠিক বিদেশ হয়ে ওঠে! তাদের দেখাদেখি আমরাও খুব করে চাইতে থাকি যে আমাদের দেশটাও বিদেশ হয়ে উঠুক। তা বিদেশ যদি হতেই হয়, তাহলে কোন দেশের মতো?

গোলমাল শুরু এই প্রশ্ন থেকেই। বিলাতের মতো হতে চাইতে নিষেধ নাই। সেটাই বরং সবাই চায়। কারণ বিলেতিরা দুইশো বছর আমাদের শাসক ছিল। তারা এখন যাদের রেখে গেছে আমাদের শাসক বানিয়ে, তারা নিজেরাও সবাই মনে-প্রাণে বিলেতি। আর বিলেত যেহেতু সমাজতান্ত্রিক স্বপ্নের বিপক্ষে, তারাও তাই মানুষের মুক্তির বিপক্ষে। সোভিয়েত ইউনিয়নকে তখন সবাই রাশিয়া নামেই ডাকে। রাশিয়া খারাপ। বিদেশ হলেও খারাপ। কারণ? কারণের লম্বা তালিকা বের করা যায়। তবে প্রধান কারণ, সেটি কমিউনিস্টদের দেশ। আমাদের কাছে কমিউনিস্টদের দেশ সম্পর্কে যা খবর আসে, সবই খারাপ। ননী ভৌমিকদের মতো অল্প কয়েকজনের হাত দিয়ে আসে সোভিয়েত দেশের মানুষদের জীবনের কথা। আসে। কিন্তু বেশিদিন আসতে দেওয়া হয় না। ছাপতে ছাপতে বন্ধ করে দেওয়া হয় লেখা। কিন্তু কর্তাদের সতর্ক হতে হতে যতটুকু এসে গেছে, ততটুকুও তাদের নিজেদের জন্য যথেষ্টই ক্ষতিকর। কারণ একাধিক। এটি একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা। দ্বিতীয়ত, সেটি ননী ভৌমিকের লেখা। যে ননী ভৌমিকের সৃজনশীলতা ও সততা নিয়ে প্রশ্ন তোলার ক্ষমতা তার সবচেয়ে বড়ো শত্রুরও নেই। আজ ননী ভৌমিকের ১১ কিস্তি চিঠি প্রকাশের এত বছর পরেও, যখন বাস্তবতা পরিবর্তিত হয়ে গেছে আকাশপ্রমাণ, যাদের নিয়ে ননী ভৌমিক লিখেছেন, সেই সমাজ এবং ব্যবস্থা মুছে যেতে বসেছে মানুষের মন থেকে, সেই তখনও 'মস্কোর চিঠি' আবারও স্বপ্ন দেখাতে পারে! কেন পারে? কেমন করে পারে?

পারে। কারণ এখনও আমাদের স্কুলগুলো নড়বড়ে বেঞ্চির উপরেই দাঁড়িয়ে থাকে। আমাদের বইগুলো মলাট ছেঁড়া উজ্জ্বলতাহীন, আমাদের বালকশরীরগুলো সভ্য পোশাকের অভাবে প্রায়শই মলিন, আমাদের খাতা-পেনসিলের অভাব এখনও অমোচিত, আমাদের শৈশবোত্তীর্ণ পেট এখনও সকালে প্রায়শই কিছু না খেতে পেয়ে স্কুলে আসায় মাঝে মাঝে মোচড় দিয়ে ওঠে, আমাদের শিক্ষক-

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

শিক্ষিকারা পড়াতে এসে বইয়ের গণিতের চাইতে নিজেদের পরিবারের মাসিক খরচের অঙ্ক মেলাতে না পারার আকুলতায় দুশ্চিন্তিতমুখ, তখন ১৩৭৫ সালের মাঘ মাসে মস্কোর স্কুলে রয়েছে– "প্রাতরাশ ও মধ্যাহ্ন ভোজনের প্রশস্ত ভোজনালয়, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিদ্যার ল্যাবরেটরি, যন্ত্রপাতিসমেত শরীরচর্চার মতো হল, যা প্রয়োজনের সময় একটু অদলবদল করে সাধারণ সভা, প্রেক্ষালয় ও পাশ করা ছাত্রছাত্রীদের নৃত্যোৎসবের মেঝে হিসেবে ব্যবহৃত হয়।... আছে ডাক্তারের ঘর, সপ্তাহে তিনদিন আসেন তিনি, নার্স আসেন প্রতিদিন।"

পারে। কারণ আমরা যে ঢাকা শহরটিতে বাস করি, সেখানে আমাদের বাসা থেকে বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত যাওয়ার আগেই পেরোতে হয় অন্তত চারটি ময়লার স্তূপ, সিটি কর্পোরেশনের রাস্তা নামক অদ্ভুত খানাখন্দ ভরা রাস্তা নামক একটি আঁকাবাঁকা মাটি-কংক্রিটের রেখা, যেখানে গায়ের সাথে বাড়ি খায় অসংখ্য মানুষের শরীর, আর রাস্তার মাথায় যেখানে বাসের জন্য আমরা মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত সন্তানরা দাঁড়াই, সেখানে মুখ ব্যাদান করে পড়ে থাকে ভনভনে মাছিওড়া ময়লার ভাগাড় যার পোশাকি নাম ডাস্টবিন। আর কোনো বাড়ির পাশে কোনো গাছ দাঁড়িয়ে থাকার সুযোগ পেলেও তাকে আর সবুজ রং দেখে গাছ বলে চিনতে পারার সুযোগ নেই। তার শরীরে পরতের পর পরত ধুলোর আস্তরণ। অথচ ১৩৭৪-এর আষাঢ় মাসেও মস্কোর যে রাস্তায় ননী ভৌমিক থাকতেন– "তার চেহারাটা ঠিক একটা লম্বা পার্কের মতো। বুক জুড়ে পরপর আট সারি বার্চ-ফার-পপলার গাছ। কয়েক সারি ঘেসো জমি, তাতে পা দেওয়া মানা। সেই সঙ্গে মধ্যে মধ্যে ফুলের কেয়ারি, বসার বেঞ্চি।" আর "বিশেষ করে মস্কোর নতুন যে পাড়াগুলো গত দশ-পনেরো বছরে গড়ে উঠেছে, তাতে বাস, ট্রলিবাস, মোটর যতই ছুটুক মনে হবে এক অন্তহীন কুঞ্জবনের মধ্য দিয়ে চলেছি।"

কুঞ্জবনের উপমা তো কালিদাসের বই ছাড়া আর কোনো কিছু দেখেই আমাদের মনে পড়ে না। আমাদের দেশে কোথাও কি কুঞ্জবন আছে? আমাদের উপমহাদেশে? কুঞ্জবন ধারণাটির সঙ্গেই কি আমাদের জাতিগত কোনো সম্পর্ক রয়েছে অবশিষ্ট? আমরা তো প্রকৃতির সাথে কবেই বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিয়েছি আমাদের শহর নামক বদখত জনপদগুলোকে! ওদিকে ননী ভৌমিক যে মস্কো থেকে চিঠি লিখছেন, সেই মস্কোতে ঘাস কেবলমাত্র হতশ্রী পরিবারের একমাত্র সম্বল একটি ছাগলের একমাত্র খাবার মাত্র নয়। তা বসন্তের অন্যতম আগমনি-চিহ্ন। বসন্ত এলেই দেখা যাবে– "কাঠি কাঠি ন্যাড়া ডালগুলোয় দেখা দিয়েছে দুধে-গোলাপি কুঁড়ি। রুশী রূপকথার রাজপুত্তুরের মতো তা বাড়ে দিনে দিনে নয়, দণ্ডে দণ্ডে।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমাদের দেশেও ডালপাতা বেড়ে ওঠে লকলক করে। কিন্তু তার বাড়ার চাইতে কাটার হার যে অনেক বেশি! আমাদের মানুষের কোনো অবসর নেই। আছে বেকারত্ব। বেকারদের কোনো অবসরযাপনের আনন্দ থাকতে পারে না। তাদের থাকে হতাশা, থাকে অবসন্নতা, থাকে আত্মক্ষয়ের প্রবণতা, কখনো কখনো থাকে প্রচণ্ড ক্রোধ। যে রাষ্ট্রে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা রয়েছে, একমাত্র সেই রাষ্ট্রের মানুষরাই আবসরযাপনের আনন্দ শুষে নিতে পারে শরীরে-মনে-আত্মায়। সেখানে তরুণরা ছুটির মাসগুলোতে গিয়ে ভরে ফেলে সমুদ্রতীর আর পাহাড়তলির স্যানাটোরিয়াম বা স্বাস্থ্যনিবাসগুলো। তাদের চাইতেও বেশি সংখ্যক তরুণ ছুটি কাটাতে নেয় অ্যাডভেঞ্চারের আশ্রয়। তাদের এই ছুটি কাটানো হচ্ছে 'দিকি, বা বুনো'। "তার অর্থ, কোনোক্রমে টিকিট কেটে উঠে পড়ো, গিয়ে নামো, হোটেলের অপেক্ষায় না থেকে স্থানীয় গৃহস্থ বাড়িতে ঘরে হোক, বারান্দায় হোক, আঙিনায় হোক; পারলে একটা ক্যাম্পখাট ভাড়া নাও, না পারলে কিছু একটা ভেবে বার কর, তারপর টো টো করে ঘোরো সারা দিন, পঞ্চাশবার সমুদ্রে ঝাঁপ দাও, ভেজা গায়ে চিত হয়ে থাকো বালির উপর, দুঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে দুমুঠো খাবার জোটাও, তারপর সন্ধে ঘন হয়ে এলে ঘনিষ্ঠ কাউকে নিয়ে গান ধরো। বা কাছের টুরিস্ট কেন্দ্রে বিনা আমন্ত্রণে গিয়ে যোগ দাও নাচে।"

আমাদের তারুণ্য তখন বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে চরম অনিরাপত্তায় অবসন্ন, বড়ো দুই দলের ব্ল্যাকমেইলের শিকার, ইয়াবা-ফেনসিডিলে আশ্রয় খোঁজে, বিনোদন বলতে বোঝে ভারতীয় নায়িকা-আইটেমগার্লদের উরু-ভুরু-স্তনের দোলা দেখা। অল্প কয়েকটি চাকরি, অল্প কয়েকটি কর্মসংস্থান; সেখানে হুমড়ি খেয়ে পড়া আর অমানবিক প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে মানসিকভাবে আরও বেশি রক্তাক্ত হওয়া। তাই বিদেশ চলো! দেশকে বিদেশের মতো বানানোর স্বপ্ন তো অনেক আগেই উধাও। এখন তাই নিজেরাই বিদেশ চলো!

"সাধ হয় বাঁচি, অনেক দিন বাঁচি, নিজের চোখে দেখে যাই আমাদের নাতিপুতিদের সুখ।" ননী ভৌমিকের কাছে এই আকুতি প্রকাশ করা মহিলাটির জীবন শুরু হয়েছিল আমাদের সখিমন-মরিয়ম-সুফিয়াদের মতোই। বাপমরা মেয়ে, সৎবাপের বাড়িতে ঠাঁই হয়নি, তিন বছর বয়স থেকে লোকের বাড়িতে এঁটোকাঁটা তাড়া খেয়ে মানুষ। দশ বছর বয়সে প্রথম নতুন জামা পাওয়ার অভিজ্ঞতা তার সোভিয়েতের এতিমখানায়। সেই মেয়ে যে উজবেকিস্তানের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতি হতে পারেন, তা কে ভাবতে পেরেছিল– একমাত্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বিপ্লব ছাড়া! তার সাথি উজবেক মানুষদের অবস্থা কি তার মতোই রমরমা হতে পেরেছিল? বোধহয় পেরেছিল। কারণ ননী ভৌমিক সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে বিপ্লবের আগে– "উচ্চশিক্ষিত উজবেক ছিল মাত্র দুজন কি একজন, আর আজ বিশ্ববিদ্যালয়, কারখানা, এমনকি খামার যেখানেই গেছি দেখেছি ময়লা রঙের এই একদা নিরক্ষর মানুষগুলোই এখন গবেষক, উদ্ভাবক, বৈজ্ঞানিক; ইঞ্জিনিয়ার; কৃষিবিদ, অ্যাকাডেমিশিয়ান; যখন শুনি সংসারে বাঁদিগিরি ছাড়া অন্য কোনো কাজ ছিল মেয়েদের একেবারে বারণ, আর এখন যারা সুতাকলে অটোমেটিক তাঁত চালাচ্ছে, শহরের রাস্তায় ট্র্যাম হাঁকাচ্ছে, চেপে বসেছে হার্ভেস্টার কম্বাইনে, রোগী দেখছে, গবেষণা করছে, লাফ দিচ্ছে প্যারাশুটে, হয়ে উঠেছে প্রাচ্যবিদ্য ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর এমনকি উজবেক রাষ্ট্রেরও কর্ণধার।"

আর আমাদের দেশের গরিব-গুর্বো ক্ষয়াটে বুড়োরা তো বটেই, বড়ো-মাঝারি চাকরি থেকে পেনশনের জীবনে চলে আসা দালানবাড়ির বাসিন্দা বৃদ্ধরা পর্যন্ত কথায় কথায় বলে– মরলে বেঁচে যাই। কারণ তো শুধু নিজেদের বেতো হাঁটু-কোমর, শর্করাভর্তি পেচ্ছাপ, রক্তচাপের উর্ধ্বমুখী লাফই নয়, সমাজের পেছন দিকে ভূতের পায়ে হাঁটাটাও তাদের কাছে যথেষ্ট বেদনাদায়ক মনে হওয়াটাও একটা কারণ হতেই পারে। অন্তত অনেকের কাছেই। এতদিন ঘাড়গুঁজে অফিস করেছেন, পরিবারের একগন্ডা-দুইগন্ডা লোক পেলেছেন, অন্যদিকে, বিশেষ করে সমাজের দিকে বা বৃহত্তর দেশের দিকে তাকানোর সুযোগ-সাহস কোনোটাই পাননি, এখন সেখান থেকে স্থায়ী ছুটির পরে ছানিঢাকা ঘোলাটে হলেও চোখটা আগের চাইতে কিছু বেশি দেখার অবকাশ যে পেয়ে গেছে! কেউ কেউ তো ষাটের দশকের কথাও ভাবেন, সত্তর দশকের কথাও। আশির দশক তো এই সেদিনের কথা। সেই দশকগুলোতে, আহা, আমাদের দেশেও তরুণদের একটি বড়ো অংশ সত্যিকারের তরুণ ছিল। তারাও সমাজ বদলের স্বপ্নটা দেখত, লেনিনকে ভাবত এই শতকের ত্রাতা, তাদের কাছে জঙ্গমত্বের সবচেয়ে বড়ো প্রতীক ছিলেন মাও সেতুং আর ফিদেল কাস্ত্রো। মহিমান্বিত মৃত্যুর স্বপ্ন দেখার সাহস ছিল তাঁদের। আর মহিমময় পরলোকগমন বা আত্ম উৎসর্গের সবচেয়ে জ্বলজ্বলে উদাহরণ চে গুয়েভারা। আকাশ-বাতাস দূষিত করার মতো চটুল গানের চল তখনও যথেষ্টই ছিল, কিন্তু হেমাঙ্গ বিশ্বাসও উচ্চারিত হতেন অনেক সংকল্পদৃঢ় ঠোঁটে। তখনও কবিতা শোনা যেত কারও কারও মুখে। তার মানে– স্বপ্নটি ছিল। ননী ভৌমিকের মস্কোর ফ্ল্যাটে স্কুলের ছেলেমেয়েরা 'মাকুলাতুরা' চাইতে আসে। পুরানো খবরের কাগজ। কী করবে ওরা সেই কাগজ দিয়ে? বাড়ি বাড়ি ঘুরে পুরানো কাগজ জড়ো করে সেই কাগজ বিক্রির টাকা দিয়ে ওরা সাইকেল আর লেখার খাতা কিনে পাঠাবে যুদ্ধের আগুনে ডুবে থাকা ভিয়েতনামের শিশুদের জন্য। আর আমাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দেশের যে শিশুরা কাগজ টোকায়, তারা কি কোনোদিন শুনতে পাবে ভিয়েতনাম নামক একটি লড়াকু জাতির দেশের নাম? ওদের পেটের মধ্যে যে ক্ষুধা নামক বোমা প্রতিনিয়ত বিস্ফারিত হয়ে লেলিহান শিখা জ্বালিয়ে রেখেছে নিশিদিন, তার তীব্রতা কমানোর জন্য কাগজ টোকাতে টোকাতেই ধ্বংস হয়ে যায় তাদের কৈশোর। তাদের যদি এখন পাঠ করে শোনানো হয় 'মস্কোর চিঠি'র শিশুদের কথা তাহলে কেমন হবে তাদের বিহ্বল মুখের চেহারা?

ননী ভৌমিকের চিঠি যদি ১১টিতে সাঙ্গ না হয়ে অবিরত ছাপা হতে থাকত, তাহলে হয়তো তিনিও দ্বিজেন শর্মার মতো অন্য ধরনের বাক্যবিন্যাসে লিখতেন–

'সোভিয়েত দেশকে দূর থেকে যেমন একটি নতুন সভ্যতার ধাত্রী ভাবতাম, এখানে এসেও মত বদলের কোন হেতু দেখিনি।... হাজার হাজার মানুষ ফ্ল্যাটবাড়িতে থাকেন একই সঙ্গে– শ্রমিক, বুদ্ধিজীবী, রাজনৈতিক নেতা। কাউকে আলাদা করে চেনার উপায় নেই।'

'অভিজাত এলাকা শব্দটি অপরিচিত।'

'ধনবৈষম্যের প্রকট পীড়নমুক্তির এমন সমাজ পৃথিবীর আর কোথায় ছিল?'

'মধ্যরাতে অনেকবার মস্কো শহরে ঘুরেছি– মানবরূপী কোনো শ্বাপদের সাক্ষাৎলাভ ঘটেনি।'

'এক অদ্ভুত শান্তি ও শুচিতা ছিল সর্বত্র।'

এমন সমাজ যাঁরা নির্মাণ করছিলেন, সেই দেশের মানুষরাই সেই সমাজটিকে ভেঙে ফেলেছেন। সমাজতন্ত্র নামক স্বপ্নরাজ্যটির পতন হয়েছে। কিন্তু আমরা বারবার ফিরে ফিরে আসি মানুষের স্বপ্ন দেখা আর স্বপ্ন দেখানোর জায়গাটিতে। মানুষ কি মুক্তির স্বপ্ন দেখবে না? আমাদের বিবর্ণ ব্যাধিগ্রস্ত জীবনকে বদলানোর জন্য আমরা কি উদাহরণ হিসেবে কোনো 'বিদেশ'কে আর খুঁজে পাব না? সেখান থেকে কি আমাদের কাছে স্বর্গীয় জীবনের বার্তা বয়ে আনবে না কোনো পত্রগুচ্ছ?

এই দ্বিধাদীর্ণ অবিশ্বাসসংকুল সময়েও উত্তর অবশ্যই নির্দ্বিধ। হ্যাঁ!

চিঠি আসবে! হয়তো সেটা মস্কো থেকে নয়। অন্য কোনো শহর থেকে।

মুক্তিমন্ত্রের সুসমাচার ঘোষিত হবে। হয়তো তার নাম সমাজতন্ত্র নয়।

চিঠি আসবে! হয়তো সেই লেখকের নাম ননী ভৌমিক নয়।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

২৬

পরদিন সকালেই শান্তি মিছিল বের হয়।

ঘর থেকে বের হতে পারেন না সন্তোষ মৈত্র।

জানালা দিয়ে দেখলেন মিছিল। বুকটা ভরে যাচ্ছে আশ্বাসে। মিছিলের সামনে আফাজ, লোকমান, চন্দন, মনা মাস্টার। হাসুকেও দেখা যায়। রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষ অভিনন্দন জানাচ্ছে মিছিলকে।

বিড়বিড় করে বলেন সন্তোষ মৈত্র—

বামপন্থার মিছিলে কত হাজার হাজার মানুষই তো যোগ দিয়েছে। আবার মিছিল ছেড়ে পথচলা ছেড়ে চলেও গেছে হাজারে হাজারে। কিন্তু কিছু মানুষ রয়ে যায় আজীবন। সংখ্যায় কখনো বেশি, কখনো কম। তারা রয়ে গেছে। কেন রয়ে গেছে তারা?

বিএনপি বা আওয়ামী লীগ করলে ক্ষমতার স্বাদ পাওয়ার সুযোগ থাকে অবধারিতভাবেই। আরও কিছু দল আছে, তারাও ক্ষমতার স্বাদ পায়। জামাত-শিবিরেও জাগতিক বেশ সুযোগ-সুবিধা আছে। তারা তো এখন ক্ষমতারও দাপুটে অংশীদার। ইসলামি দল যারা করে, তারা ইহকালে না পেলেও পরকালে পাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত। কিন্তু বামের তো ইহকাল-পরকাল কোনোটাই নেই। এখন তো সোভিয়েত ইউনিয়নও নেই যাকে মডেল হিসেবে তুলে ধরা যায়। তাহলে এই মানুষগুলো বামপন্থাতেই থেকে যায় কেন? কী আছে এখানে? ওরা কি চরমতম বোকা?

কারণটা কি কেবল নিজেকে গড্ডলিকার বাইরে রাখার সান্ত্বনা? নাকি এখানে তারা এমন একটি কষ্টিপাথর পায় যা দিয়ে পৃথিবীকে মূল্যায়ন করা যায়? নিজেকে গৌণ করে সমগ্র মানবজাতিকে নিয়ে ভাবতে শেখা যায়? পৃথিবীর ইতিহাসের সত্যিকারের চালিকাশক্তিকে চেনার একটা উপায় পাওয়া যায়? নিজের জীবনের ভোগবিলাসই যে মানুষের মোক্ষ নয়, এই সত্যটা গভীরভাবে অনুভব করা যায়? পঁচানব্বই ভাগ মানুষকে বঞ্চিত করে নিজে সুখে থাকা যে মানবতা নয়, এই সত্যটা উপলব্ধি করা যায়? আর সেই উপলব্ধি অনুসারে কাজ এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা যায়? এটাও হয়তো একধরনের আত্মঅহংকার। কিন্তু এই অহংকার মানুষকে মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন করে না। বরং মানুষের সাথে আরও সংলগ্ন হওয়ার জন্য ভেতরে আকুলতা সৃষ্টি করে। বামপন্থায় নিজের বা নিজেদের ভুলকে স্বীকার করার সৎসাহস

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দেওয়া হয়। ইহজীবনে নিজে ক্ষমতা-স্বচ্ছলতা-প্রাচুর্যের স্বাদ না পেলেও পরের প্রজন্মের জন্য একটা বাসযোগ্য পৃথিবী গড়ে তোলার যুদ্ধে অংশ নেওয়ার তৃপ্তি পাওয়া যায়। সত্যের মুখোমুখি দাঁড়ানোর সাহস পাওয়া যায়। এখানে এসে ধর্মের নামে ফাঁকিবাজির ভড়ংটা চেনা যায়। কারণ যেকোনো মানুষ দেখতে চাইলেই দেখতে পাবে যে মুসলমান শোষণ করার ক্ষেত্রে কোনো মুসলমানকে ছেড়ে কথা বলে না। হিন্দু অত্যাচারীর হাত থেকে দুর্বল হিন্দুরও রক্ষা নেই। তারা খুব ভালোভাবে জানে যে গণতন্ত্র নামের যে পদ্ধতিটাকে সর্বরোগের দাওয়াই বলে গেলানো হচ্ছে, তা একটা মহা ধাপ্পাবাজি ছাড়া আর কিছুই নয়। এখন নিজেদের এই ছিন্নভিন্ন অবস্থাতেও অন্তত পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে ঘৃণার আগুনকে বুকে বয়ে নিয়ে চলাটাই মানুষ হিসেবে প্রধান কাজ। সেই কাজটুকু করে চলার অহংকার থেকে সে নিজেকে বঞ্চিত করতে চায় না বলেই তার এই বিপরীতমুখী পথচলা। তারা বিশ্বাস করে, এখন তারা দুর্বল বটে, কিন্তু পুঁজিবাদের রাক্ষুসে লোভের হাত থেকে মানবজাতিকে মুক্ত করার জন্য আবার ফিনিক্স পাখির মতো জেগে উঠবে বিপ্লবী শক্তি।

মাক্সিম গোর্কির মতো কেউ না কেউ আবার একদিন 'পাভেলের মা'কে দিয়ে কথা বলাবে তাদের সম্পর্কে– 'নিজেদের দিকে চায়নি তারা, নিজেদের লাভের কথা না-ভেবে দুনিয়ার মানুষের সুখের পথ তারা দেখিয়ে দেবে। কাউকে ঠকায়নি, ঠকাতে চায়নি। এ বড়ো শক্ত পথ। কাউকে তারা জোর করে টেনে আনেনি। খুদ-কুঁড়ো পেয়ে তুষ্ট হওয়ার মানুষ নয় ওরা। যতদিন-না সমস্ত পৃথিবী থেকে লোভ, শোষণ, ধোঁকাবাজি একেবারে শেষ হয়ে যাবে ততদিন ওরা থামবে না। কারও কাছে মাথা নোয়াবে না।'

২৭

ফরহাদ বাড়ি ফিরতে পারেনি। এতদিন বড়ো মুখ নিয়ে পার্টির কাজ করেছে। আজ পার্টির অফিস ভাগাভাগির দিনে সে বাড়ি ফেরার কথা ভাবতে পারেনি।

পুরানা পল্টনেরই একটা হোটেলের ঘরে সিলিং ফ্যানের সাথে বিছানার চাদরে নিজের গলা পেঁচিয়ে নিজেকে মেঝে থেকে বেশ খানিকটা উপরে তুলে দিয়ে ঝুলছিল সে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পুরু ময়লা জমা টেবিলের উপর কয়েকটা ছেঁড়া পাতা উড়ছিল ফরফর করে। সেগুলোতে হিজিবিজি কিছু লিখেছিল ফরহাদ। সেগুলো জোড়া দিলে কয়েকটা শব্দ-সাজানো পঙ্‌ক্তি পাওয়া যায়–

মিশে গেছে ভদকা ও হুইস্কির রঙ!

আমাদের পথপ্রদর্শকরা মেতেছে পথ ভোলানোর ষড়যন্ত্রে।

আমাদের নেতারা পরেছে বিশ্বাসহন্তার পোশাক।

প্রিয় নারীরা মেতেছে অবৈধ সঙ্গমে।

প্রিয় পুরুষরা খুবলে নিচ্ছে আমাদের বুক থেকে রক্ত-কলিজা।

তারা আজ আমাদের কলিজা দিয়ে বানানো গ্রিল আর নানরুটি খেয়ে

উদ্‌যাপন করবে লাখো মানুষের স্বপ্নভঙ্গের সার্থকতা।

আমি দেখতে চাই না, তাই চলে যাচ্ছি।

–

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও